'প্রহেলিকা সিরিজের' পঞ্চত্রিংশ গ্রন্থ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

দাম এক টাকা

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস্. সি. মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

উৎসর্গ

সোদরোপম সহপাঠী বন্ধু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার

করকমলেষু—

ভালোবাসার ঋণের বোঝা
বড্ড ভারী ভাই,
হালকা যদি করতে পারি,
এগিয়ে এসে তাই
'লাল দলিলে'র উজল কথা
দিনু তোমার হাতে,
স্মৃতি আমার রইবে জেনো
তোমার সাথে সাথে !

৩০শে শ্রাবণ
১৩৫৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড ছোরা হস্তে অশোকবাবুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

[পৃঃ ৯৩

লাল দলিল

এক

অন্ধকার—হাল্কা অন্ধকার!—তাহারই ফিকে আলোয় মনে হইল, জানালার পাশ হইতে সাঁৎ করিয়া একখানি মুখ যেন পাশে সরিয়া গেল!

দীপক সোজা হইয়া বসিল। নিজের অজ্ঞাতেই তাহার মুখ হইতে এক অস্ফুট ভয়ার্ত্ত শব্দ বাহির হইল, "কি এ?"

রমেন তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জানালার দিকে তাকাইল বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে অতিমাত্র বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দীপক? কি হলো?"

দীপক কহিল, "বাইরে কে এসেছিল রমেন! সম্ভবতঃ ঐ জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা কেউ শুনছিল! তার উদ্দেশ্য ছিল—আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনে, লুকিয়েই চলে যাওয়া! কিন্তু সে আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে ভাই! আমি ওদিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকালেও তাকে দেখে ফেলেছি; আর শুধু তাই নয়, তাকে চিনেও ফেলেছি!"

—"কে? কে সে?" রমেনের কণ্ঠস্বরে কৌতূহল!

—"কে সে, তা আজ বলবো না, বলবো কাল। কারণ,

আমার মনে হচ্ছে—এর পর আমার একটু সাবধান থাকা ভালো। কিন্তু এত বড় একটা বোর্ডিংএ—ছুটির সময়, ছেলেরা যখন প্রায় সবাই বাড়ী চলে গেছে, এম্‌নি সময়—আমার মতো রোগাটে একটা ছেলে—বিশেষতঃ, একা ঘরে যাকে থাক্‌তে হচ্ছে,—তাকে খানিকটা সাবধানেই থাক্‌তে হবে বৈকি! ক্লাবের সেক্রেটারী বা যাই-কিছু হই না কেন,—বড্ড-বেশী সাহস দেখানো বা বীরত্ব-ফলানো একেবারেই সঙ্গত হবে না, —এমন একটা দামী কথা, কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে দিচ্ছে রমেন! কাজেই আজ আর এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করবো না—কোন বিষয়েই আলোচনা করতে আজ আমি নারাজ। আজ তাহলে তুমি বাড়ী যাও রমেন!"

বিস্ময়ে রমেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ তাহার মুখ হইতে সামান্য টুঁ শব্দও বাহির হইল না! অবশেষে কতকটা আহত ভাবে সে কহিল, "আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে দীপক! চোর হোক্‌ বা বদ্‌মায়েস হোক্‌, কেউ এসে না-হয় আমাদের কথা শুনেই গেল!

কিন্তু কি বা এমন কথা! কথা তো হচ্ছিল তোমার সঙ্গে নরেনের সম্প্রতি যে মন-কষাকষিটা হয়ে গেল, সেই বিষয়ে। সে তো সাধারণ কথা—অমন মন-কষাকষি কত জনার সঙ্গেই হয়ে থাকে! সে কথা কেউ শুনে গেলেও, এমন একটা মারাত্মক কিছুই নয়! তাতে আর কার কি লাভ হতে পারে? আর তোমারই বা এমন একটা আতঙ্ক হবে কেন?"

দীপক চিন্তিত ভাবে বলিল, "আমি তোমার কোন কথারই জবাব আজ দেবো না—যা বলতে হয়, তা বলবো কাল। কাল সকালে দশটা-এগারোটার সময় এসো, তখন আলোচনা হবে।"

রমেন কহিল, "আলোচনা কাল করো, বেশ্, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু একটা কথা বলো দীপক! যাকে তুমি দেখেছ কে সে? আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন একটা কিছু খুনোখুনির আশঙ্কা করছ! কাজেই, লোকটা কে, তা আমি জানতে চাই।"

দীপক কহিল, "মাপ করো ভাই! আমি যাকে দেখেছি, আর যে ভাবে দেখেছি,—সেকথা শুনলে তুমিও হয়তো আমায় পাগল বলেই উড়িয়ে দেবে! আমি এখন পর্য্যন্ত আমার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না! মনে করো, তোমাকে যদি আমি কখনো খুনীর সাজে দেখি বা কাউকে খুন করতে দেখি, তাহলে সে জিনিষটা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? না, কাউকে বিশ্বাস করানো যায়? মনে হবে, বুঝি ভুলই দেখে থাক্‌বো!

এই ব্যাপারটাও ঠিক্ তেম্‌নি রমেন! আমার এখনো সন্দেহ হচ্ছে—যা দেখেছি, তা হয়তো ভুল দেখেছি! কাজেই আমার মাথাটা খানিক জুড়োতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও, তারপর কাল তোমার সঙ্গে কথা কইবো।"

রমেনের বিস্ময় আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। একটু

চিন্তা করিয়া সে কহিল, "তাহলে এক কাজ করা যাক্ দীপক! তোমার যেখানে এত আশঙ্কা, সেখানে তোমাকে আর একা ফেলে আমি চলে যেতে পারি না। কাজেই আমিও আজ তোমার এখানেই থাকি। এসো, বিছানাটা পেতে ফেলা যাক্, আজ দু'জনে এক সাথেই শোবো।"

দীপক যেন এইবার একটু বিপদে পড়িল! কিছু ভয় সে পাইয়াছে বটে, কিন্তু তবু নিজকে সে এত দুর্ব্বল বা ভীরু মনে করে না যে, এখন রমেনকে তার কাছে শোয়াইতে হইবে! বিশেষতঃ তাহার মনে হইল—যাহা সে দেখিয়াছে, তাহা যত সন্দেহজনকই হউক্ না কেন, আসলে তাহার মূলে যদি কোন কারণই না থাকে, অথচ তাহাকে যদি রমেনের পাহারা দিতে হয়,—তাহা হইলে এই ব্যাপারটা লইয়া তাহার বন্ধু-মহলে একটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের জোয়ার বহিয়া যাইবে!—

দীপক তাহা একেবারেই পছন্দ করে না, কাজেই সে তীব্র আপত্তি করিয়া কহিল, "না, না, রমেন! ওসব কিছুই তোমার করতে হবে না। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় যে, সেজন্য আমাকে তোমার পাহারা দিতে হবে।"

—"তাহলে বলো, কে সেই লোক?"

দীপক দেখিল রমেন একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছে! নামটা বলিলে, হয়তো সে তাহা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে, এখানে থাকিবার জন্য আর জিদ্ করিবে না!

কাজেই সে কহিল, "তাহলে তুমি শুনবেই রমেন? কিন্তু শুনে তোমার কোনো লাভই হবে না।"

—"আমি তো কোন লাভ করতে আসিনি দীপক! বলো, কাকে তুমি দেখেছ, আর কেমন অবস্থায় দেখেছ?"

—"তাহলে আর এখানে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না?"

—"না, করবো না।"

—"তাহলে শোনো।"

দীপক একটু থামিয়া আবার কহিল, "যাকে দেখেছি, তাকে খুনীর বেশেই দেখেছি! হাতে তার ছোরা—লম্বা, ঝক্‌ঝকে! কিন্তু নামটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তবু তা সত্যি—দিনের আলোর মত পরিষ্কার ও সত্যি —চোখে আমি ভুল দেখিনি!"

অধীরভাবে রমেন কহিল, "অত ভণিতায় দরকার নেই— বলো কে সে?"

—"সে হচ্ছে আমাদেরই নরে……"

সেই মুহূর্ত্তে দম্ করিয়া একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল— সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া দীপক চেয়ার হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল!

খোলা জানালা-পথে কে তাহাকে পেছন হইতে গুলি করিয়াছে!

দুই

খবরটা ছড়াইয়া পড়িল দাবানলের মত!—রাত্রিতেই সকলে শুনিল, "বয়েজ্ ক্লাবের" সেক্রেটারী দীপককে নরেন গুলি করিয়া খুন করিয়াছে!

সকলেই বিস্মিত হইল—চমকিত হইল। সকলেরই মনে প্রশ্ন হইল, একি সম্ভব?

বাস্তবিকই খবরটা খুবই অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য! দীপক ও নরেন একই স্কুলে পড়ে,—একই ক্লাশে পড়ে। দীপক অমায়িক, সাহসী ও হাসিখুসি। নরেনও সচ্চরিত্র এবং বিনয়ী। শুধু তাই নয়, নরেন ক্লাশের প্রথম ছাত্র। এবারও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া সে ফার্স্ট ক্লাশে উঠিয়াছে! কাজেই এমন একটি ছেলে যে তার কোন সহপাঠী বন্ধুকে খুন করিয়া ফেলিতে পারে, এমন কথা বিশ্বাস করাও কঠিন!

কিন্তু দুনিয়াতে অনেক অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়—আর অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাও সত্য হইয়া ওঠে! এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় বৈকি! বিশেষতঃ, এই সাংঘাতিক কাণ্ডে একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী রয়েছে—রমেন।

সে জোর করিয়াই বলিল, "দীপকের সঙ্গে নরেনের একটা ঝগড়া হয়েছিল বিকেল বেলা। দীপক আমাকে রাতে সেই কথাই বলছিল। এমনি সময়, সে খোলা জানালায় একটা-

কিছু দেখে চম্‌কে ওঠে। আমি তাকে অমন চম্‌কাবার কারণ জিজ্ঞেস্‌ করি।

সে বলে যে, একটা অসম্ভব দৃশ্য সে দেখেছে—তাইতে সে একটু ভয় পেয়েছে। আমি বারবার পীড়াপীড়ি করায় সে বললে যে, একটা লোককে সে এইমাত্র খুনীর বেশে দেখতে পেয়েছে! সে গোপনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল!

লোকটা কে, আমি তা বড্ড বেশী চেপে জিজ্ঞেস্‌ করায়, দীপক তার নামটা মাত্র উচ্চারণ করেছে,—শুধু সে 'নরে' পর্য্যন্ত বলেছে, এম্‌নি সময় সে খুন হয়ে গেল! কাজেই নরেন যে খুনী, সে-ই যে দীপককে খুন করেছে, এতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই!"

খুনের সংবাদ পাওয়ামাত্রই পুলিশ আসিয়াছিল। তাহারা সংক্ষেপে রমেনের বক্তব্য বিষয় শুনিয়াই নরেনকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্কুল-বোর্ডিংএর যে ঘরখানায় সে ছিল, দেখা গেল,—সেখানে তাহার সব-কিছুই পড়িয়া আছে—কিন্তু নরেন নাই! ইহাতে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, নরেনই অপরাধী—নরেনই খুনী!

তথাপি যে শুনিল, সে-ই বিস্ময় বোধ করিল! কারণ, নরেনের মত ভাল ছেলে এমন একটা কাজ করিয়া বসিবে! কিন্তু তখন আর সন্দেহের অবকাশ কই?—সে যত ভাল ছেলেই হউক না কেন, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে অবশেষে তাহারই একজন সহপাঠী বন্ধুকে খুন করিয়া বসিল!

প্রাচীন অভিভাবকদের একজন বলিলেন, "সবই বুঝলুম, ছোঁড়াটার মাথা নয়তো গরমই হয়েছিল! কিন্তু পিস্তল সে পেলে কোথায়? বিশেষতঃ কী বা এমন একটা ঝগড়া!

যা শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে—আসলে ঝগড়া হচ্ছিল রতন ও নরেনের মাঝে! দীপক তাতে গুটিকয়েক কথা বলেছিল রতনের পক্ষ হয়ে। শুধু এই তো! কিন্তু তাতে কি এমন একটা খুন-খারাপী হতে পারে? না, তা সম্ভব?"

শ্রোতাদের একজন কহিল, "এখন আর সে তর্ক করে লাভ কি মশাই? দীপকের মুখে নরেনের নামটা উচ্চারিত হওয়ার সাথে-সাথেই দীপক খুন হয়ে গেল! আর নরেনও রাতের অন্ধকারেই কোথায় সরে পড়লো!—মাত্র এ দুটো কথা বিচার করলেই তো নরেনের দোষ-গুণ প্রমাণ হয়ে যায়! এ নিয়ে আর কথা কইছেন কেন? এখন আরও ভাল করে জানতে পারবেন একবার যদি রতনকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস্ করেন!

নরেন খুনী, নির্ঘাত খুনী,—পুলিশ তাকে ঠিক্ই সন্দেহ করেছে।"

বাস্তবিক, পুলিশ তো আর বোকা নয়! তাহারা লাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, আসামী নরেনের নামে 'ওয়ারেণ্ট' বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিল।

ছোট্ট কাজিরপাড়া গ্রামখানিতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল!

তিন

নরেনের কীর্ত্তি শুনিয়া রতন নিজেও কম বিস্মিত হয় নাই! নরেন, রতন, দীপক ও রমেন, ইহারা সকলেই সমপাঠী ও প্রায় একই বয়সের ছেলে; খেলেও তাহারা একই ক্লাবে।

তাহাদের ক্লাবের নাম 'বয়েজ্ ক্লাব'। দীপক তাহার সেক্রেটারী, আর নরেন তাহার ক্যাপ্টেন্। আর রতন ও রমেন ক্লাবের দুটি নামকরা খেলোয়াড়।

রতন বিস্মিত হইল প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ, নরেন খেলায় যেমন, লেখাপড়ায়ও সেইরূপ; সে তাহাদের ক্লাশের 'ফার্ষ্ট'-বয়্', মনও তাহার খুব উঁচু। তাহার মত একটি ছেলে কি এমন ভাবে একটি বন্ধুকে খুন করিতে পারে?

বন্ধু বৈকি! তাহারা চারি জনেই বন্ধু—পরম বন্ধু। তাহাদের লেখাপড়া, খেলাধূলা—সবই যে এক সঙ্গে! এক নিবিড় বন্ধুতা তাহাদিগকে একসাথে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নরেন তাহা হইলে কেমন করিয়া এমন একটা সাংঘাতিক কাজ করিয়া ফেলিল?

ইহা ছাড়া, রতনের বিস্ময়ের আরও একটা কারণ ছিল।

বন্ধু তাহারা চিরদিনই। তবু সেদিন কিছু অপ্রীতিকর

ব্যাপার একটা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে সে ব্যাপারটা হইয়াছিল রতন ও নরেনের মধ্যে। দীপক তখন রতনের কাছে উপস্থিত ছিল ; সে তাহাতে যোগদান করে ও গুটি-কয়েক কথা বলে। নরেন তখন তাহাদের দুই জনকেই শাসাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই শাসানি যে এমন একটা খুনে যাইয়া পরিণত হইবে, তাহা কে তখন ভাবিতে পারিয়াছিল ?

রতন ভাবিল, নরেনের যদি এমন একটা চণ্ডাল-রাগই হয়ে থাকবে, তাহলেও সে আমায় খুন না করে দীপককে খুন করলে কেন ? তাকে অপমান যদি কেউ করে থাকে, সে করেছি আমি ! দীপক আর এমন কি বলেছিল ?

কাজেই রতন তাহার নিজের মনের মধ্যে নরেনের কাজের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না !

সেদিন বিকেল বেলা রতন ও নরেনের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল, গভীর ভাবে সে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কয়েক মাস আগে রতন পাঁচ টাকা দিয়া একখানি লটারীর টিকিট কিনিয়াছিল। সম্প্রতি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, রতন তাহার প্রথম পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে ! প্রথম পুরস্কার মানে,—এক লক্ষ টাকা। এই লক্ষ টাকার পুরস্কারকে কেন্দ্র করিয়াই রতন ও নরেনের বিবাদটা গড়িয়া উঠে !

নরেন ও রমেনের মত রতনও স্কুল-বোর্ডিংএ থাকিয়া লেখাপড়া করিত। বিকেল বেলা রতনের ঘরে নরেন আসিয়া প্রস্তাব করে যে, লাখ টাকা পুরস্কার পাইলে সে যেন দশ হাজার টাকা তাহাদের বয়েজ্ ক্লাবে দান করে!

রতন তাহার সেই প্রস্তাব ভালভাবে গ্রহণ করে নাই। নরেন তখন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "আজ তুমি অস্বীকার করবে বৈ কি! ভিখিরীর হাতে এসে গেলো কুবেরের ভাণ্ডার! সে এখন আগডুম্-বাগডুম্ অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখ্‌বে তো! তোমার এখন তেম্‌নি অবস্থা রতন!"

'ভিখিরী' কথাটা রতন সহ্য করিতে পারে নাই। কাজেই তখন হয় একটু কথা-কাটাকাটি। রতন অবশেষে তাহাকে বলিয়াছিল, "আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে নরেন! তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—এখনই, এই মুহূর্ত্তে!"

নরেনও ছাড়িবার পাত্র নহে। বিশেষতঃ রতনকে সে দীর্ঘকাল নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। কাজেই সেও উত্তপ্ত হইয়া তাহাকে জবাব দেয়, "হাঁ, এখন তাই তুমি বল্‌বে রতন! কিন্তু মনে রেখো, দু'দিন আগেও এই নরেনই ছিল তোমার একমাত্র আশা-ভরসা, একমাত্র সহায় ও সম্বল!

কলেরা হয়েছিল তোমার; বোর্ডিং থেকে সবাই পালিয়ে গিয়েছিল তোমায় একলা ফেলে; কিন্তু কে তখন তোমায় সেবা-যত্নে আবার মানুষ করে তুলেছিল? ইস্কুলের মাইনে দিতে পারনি বলে তোমার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হতে যাচ্ছিল;

কিন্তু কে তখন নিজে ধার করেও, সে বিপদ্ থেকে তোমায় উদ্ধার করেছিল বলতে পার?"

—"নিশ্চয়ই পারি।"

রতন দ্বিগুণ জোরে সে কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলে, "নিশ্চয়ই পারি নরেন! সেকথা আমি কখনো ভুলিনি, ভুলব না। কিন্তু তোমার সেই উপকার কি তুমি আমায় অযাচিত ভাবে, নিঃস্বার্থ ভাবে করে যাওনি নরেন?

আমি তো জানতাম, তুমি তাইই করেছিলে! তাই তোমাকে শুধু আমি আমার বন্ধুর আসনেই বসাইনি,—তোমাকে খানিকটা স্বর্গের দিকেও এগিয়ে দিয়ে, মুগ্ধভাবে তোমায় দেখেছিলাম! কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, তুমি আমার বুকটাকে চৌচির করে ভেঙে দিয়েছ! কারণ, তুমি যা করেছিলে, সে তো নিঃস্বার্থ নয়,—সুদ-আসলে কড়া-ক্রান্তি হিসেব করে, তুমি তার প্রতিদান আশা করেছিলে নরেন!

লটারীর টিকেট তো সবাই কিনেছিলে ভাই! ভাগ্যের ফলে আমারই নামে না হয় প্রথম পুরস্কারটা উঠেছে। আমি আশা করেছিলাম, তোমরা, বিশেষতঃ তুমি,—হাসিমুখে কাছে এসে সে জন্য অভিনন্দন জানাবে! কিন্তু ছিঃ নরেন, তুমি এলে তোমার সেই গত জীবনের উপকার মনে করিয়ে দিয়ে, আমার কাছ থেকে একটা মোটা দাঁও কসবার আশায়! তুমি যে—"

বাধা দিয়া নরেন বলে, "থামো, থামো রতন! আমায়

কিছু বলতে দাও। মোটা দাঁওটা তুমি আমার কি দেখ্‌লে? আমি কি আমার কোন ব্যক্তিগত লাভের আশায় তোমার কাছে এসেছি? তুমি ও আমি একই ক্লাবের মেম্বার। আমি না হয় ক্যাপ্টেন্ আছি, কিন্তু তুমিও তো মেম্বার। আর এই তো দীপক রয়েছে, সেও এর সেক্রেটারী।

তুমি জানো, এই দীপক জানে, যে কি দরিদ্র আমাদের এই ক্লাব, অথচ কত মহান্ আমাদের উদ্দেশ্য! কিন্তু টাকা ছাড়া তো কোন বড় কাজই হতে পারে না! তাই তোমায় অনুরোধ করতে এসেছিলাম যে, প্রথম পুরস্কারের লাখ টাকা পাওয়ামাত্র, তুমি তা থেকে দশ হাজার টাকা আমাদের ক্লাবকে দান করো রতন! কিন্তু কথাটা শোনামাত্র তুমি যে-ভাবে তেড়ে উঠ্‌লে, তা বড়ই আশ্চর্য্য! ও যে-কোন ভদ্র ছেলের পক্ষে জঘন্য!"

দীপক এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিল। কিন্তু এই সময় সে বলে, "যাক্ ভাই নরেন, এ নিয়ে আর কথা বাড়াচ্ছ কেন? রতনের লাখ টাকা থেকে রতন যদি কিছু না দেয়, তাতে কি আর আমাদের জোর চলে ভাই?"

নরেন বলে, "না, জোর চলে না, সেতো জানি! কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য দাবীর কাছে একটু মাথা নোয়ানো উচিত। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, সে না হয় আজ লাখ টাকার মালিক হয়েই বসেছে! কিন্তু তাই বলে এত অহঙ্কার বা এত তেজ থাক্‌বে কেন? সে আমাকে বলে কিনা, 'বেরিয়ে

যাও!' কিন্তু দু'দিন আগে তো এতবড় সাহস তার ছিল না!"

রতন তাহার কথাটা প্রায় লুফিয়া লইয়া তখনই উত্তর দিল, "তার কারণ হচ্ছে, তুমি সে রকম ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র! যে পরশ্রীকাতর, সে কি কখনো অন্যের লাখ টাকা সহ্য করতে পারে?

দেখো দীপক! মাত্র চার-পাঁচ দিন যাবৎ পুরস্কারটা ঘোষণা করা হয়েছে—খবরের কাগজে আমার নাম বেরিয়েছে, আমি লাখ টাকা পুরস্কার পাব! কিন্তু এরই মধ্যে যেন চারদিক্ থেকে একটা হৈচৈ উঠেছে! সবারই মুখে শুধু একটা মাত্র দাবী—'কিছু দাও!'

কেউ বলছে পরিষ্কার ভাবে—'কিছু টাকা দাও।' কেউ বলছে কিছু ঘুরিয়ে, 'টিকেটখানা বেচে ফেলো, তাহলে এখনই কিছু নগদ টাকা পেয়ে যাবে! কেন আর মিছে দু' তিন মাস অপেক্ষা করবে? কি জানি, কবে কখন্ বোমা পড়বে, তাহলে যে সবই ভেস্তে যাবে!'

এত সব দাবীর চোটে আমি পাগল হয়ে গেছি দীপক! কাজেই আমি এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এ সম্বন্ধে আমি আর কারো সঙ্গে কোন কথা কইব না—নরেনের সঙ্গেও না!"

নরেন বলিল, "অন্যের সাথে তুমি আমাকেও জড়িয়ে ফেললে রতন! তুমি আমাকেও অন্য সবার সাথেই মিশিয়ে দেখ্ছ! ঐখানেই তোমার যত গলদ! একবার ভাবলে না

যে, আমাকে তুমি কোন হিসেবেই ওদের সাথে এক করে মিশিয়ে দেখতে পার না। এমন কি, যে পাঁচ টাকার লটারীর টিকেট কিনে তুমি আজ দস্তের মালীক হয়েছ, সেই পাঁচ টাকার মধ্যেও কি একটা টাকা আমার সাহায্য নেই ?”

“সাহায্য ?” রতনের মুখের উপর দিয়া যেন একটা আগুনের হল্‌কা বহিয়া গেল ! সে আবার বলিল, “সাহায্য ? আমি কি তোমার কাছে কোন সাহায্য বা ভিক্ষে চেয়েছিলাম ? সে টাকা আমি কি তোমার কাছ থেকে ধার চেয়ে নিইনি নরেন ?”

—“হাঁ, তুমি তাই বলেছিলে বটে ! কিন্তু আমি তোমাকে কোন দিনই ধার ভেবে কখনো কিছু দিইনি। কারণ, আমি জান্‌তাম, টাকা শোধ করবার ক্ষমতা তোমার কোন দিনই নেই। কাজেই ধার বা দান বলতে আমি একই মানে বুঝে নিয়েছিলাম !”

নরেনের কথায় একটা তীব্র অপমানের অনুভূতি রতনের মুখের উপর সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। সে আহত ভাবে জবাব দেয়, “বটে ! এতদূর !”

ঈষৎ ঘৃণার সঙ্গে নরেন বলে, “এতে আর এত দূরের কি আছে রতন ? লটারীর দৌলতে আজ না হয় তুমি অনেক কিছুই ধার বলে মেনে নিতে পার ; কিন্তু দুদিন আগে তোমার যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থায় ‘ধার’ কথাটা কি তোমার পক্ষে একটা অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হত না ! আজ তুমি—”

বাধা দিয়া রতন তাহাকে বলিয়াছিল, "থামো, নরেন, থামো! আর, শুধু থামো নয়, দয়া করে আমার ঘর থেকে এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কোন কথা কইতে চাই না!"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নরেন জবাব দেয়, "তা আর চাইবে কেন? লটারীর দৌলতে তুমি আজ এতই ফেঁপে উঠেছ যে, সারাজীবন যে তোমার উপকার করে এসেছে, যার সাহায্য না পেলে এতদিন তোমার অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হত,—এমন কি, তোমার লটারীর টিকেটেও যার ছোঁয়াচ্ লেগে রয়েছে,—আজ তুমি তাকেও—"

—"চুপ্ রও নরেন! মানুষের সহ্য-শক্তির একটা সীমা আছে—"

—"নিশ্চয়! কিন্তু অকৃতজ্ঞতার কোন সীমা নেই বুঝি?"

দীপক এবার কিছু তীক্ষ্ণভাবে নরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "নরেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ,—সীমা সব-কিছুরই আছে; কিন্তু অভদ্রতার সীমা নেই! তা নইলে এমন সব কথা তুমি বলতে পার?"

এবার নরেনও তাহাকে জবাব দিতে কসুর করে না। সে বলে, "দেখো দীপক, অভদ্র কে, তাতো প্রমাণই হয়ে যাচ্ছে! আমি কথা কইছি রতনের সাথে; তুমি কেন মাঝখানে এসে দালালি করছ?"

দীপক বলে, "দালালি আমি করছি, না তুমি করছ?

দীপক চেয়ার হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল! [পৃঃ ৫

ক্লাবের জন্য যে দশ হাজার টাকা চাইতে এসেছ, সে ক্ষমতা তোমায় কে দিয়েছে নরেন?

ক্লাবের তুমি ক্যাপ্টেন; কিন্তু আমি তো ক্লাবের সেক্রেটারী! আমার সঙ্গে একবার তুমি এ বিষয়ে একটু পরামর্শ করেছিলে? আমার সঙ্গে একটু কথা না কয়ে, তুমি যে আজ—"

"সে কি আমার নিজের পকেটে পূরবার জন্য দীপক? দুপুর বেলা শুয়ে-শুয়ে এই কথাটা মনে হয়ে গেল, কাজেই চট্ করে রতনের কাছে এসেছিলাম! তা আইনের দিক্ দিয়ে আমার একটু দোষ হতে পারে বটে,—কিন্তু বিচার করো আমার মনের দিকে তাকিয়ে।"

দীপক বলিল, "সে তো পরের কথা! কিন্তু স্বীকার তোমাকে করতেই হবে যে, দালালি করেছ তুমি,—আমি নই।"

তর্ক-বিতর্কের আবহাওয়াটাকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য রতন বলিল, "থাক্ দীপক, তোমাকে আর কোন কথা বলতে হবে না। আমিই সোজা কথা বলে দিচ্ছি।

শোনো নরেন, তুমি আর অসভ্যের মত এখানে ঝগড়া না করে, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—এই হচ্ছে আমার শেষ অনুরোধ।"

"আর সে অনুরোধ রক্ষা না করলে, তুমি মারবে বুঝি? কেমন?" নরেন প্রশ্ন করিল।

কর্কশ ভাবে রতন এবার জবাব দেয়, "হাঁ, দরকার হলে, তা মারবো বৈকি! তোমার মত অসভ্যকে শায়েস্তা করতে হলে—"

বাধা দিয়া নরেন বলে, "সে তুমি পার, আমি স্বীকার করছি। বিশেষতঃ তোমরা এখন দলে ভারী—দীপককেও সাথে পেয়েছ! বাড়ীতে পেয়েছ যখন, তখন মারবে বৈ কি! বাড়ীর কুকুর বাড়ীতেই ঘেউ ঘেউ করে—"

"সাবধান! আবার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি।" রতনের কণ্ঠে বজ্রের আওয়াজ!

বিদ্রূপের সহিত নরেন বলে, "সাবধান নিশ্চয়ই করবে! দুটি ষণ্ডা-মার্কণ্ড জুটেছ এক সাথে! এখন কি আর—"

রতন ও দীপক দু'জনেই এবার প্রায় একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। দীপক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "যাও, বেরোও নরেন! এখানে আর ইতরামি করতে হবে না।"

"তুমি কে? রতনের ঘর থেকে বার করে দেবার তুমি কে দীপক?"

একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া রতন বলে, "ঠিক্ বলেছ নরেন! আইনমত কাজ হওয়াই উচিত। তুমি চুপ্ থাকো দীপক, আমিই বলছি।"

পরক্ষণেই সে কর্কশভাবে নরেনের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি নরেন, তুমি তাহলে যাবে না, কেমন?"

রতন এক পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল।

নরেন এক মুহূর্ত্ত গম্ভীরভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর যেন অনেকটা সংযত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "যাব না কেন? যাচ্ছি। তোমার ঘরে বসে তোমার সঙ্গে জোর করবো, এতবড় মূর্খ আমি নই! কিন্তু মনে রেখো, আমি সহ্য করলেও, ঈশ্বর কখনো তোমার এই দম্ভ সহ্য করবেন না। তোমাকে এজন্য অনুতাপ করতে হবে রতন, তা মনে রেখো।"

"হাঁ, তা রাখবো। কিন্তু দয়া করে তুমি এখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও দেখি—লক্ষ্মী ছেলেটির মত!"

"বেশ যাচ্ছি।"

অপমানে ও দুঃখে এবার নরেনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে আবার বলিল, "যাচ্ছি রতন, যাচ্ছি! আর সম্ভবতঃ, তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। বন্ধুত্বের অভিনয় যে এত কদর্য্য ও কুৎসিত হতে পারে,—রতন ও দীপক, আজ তোমাদের কাছেই তা প্রথম শিখ্‌ছি!

বেরিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু একটা জিনিষ তোমরা দু'জনাই মনে রেখো। এই অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। তোমাদের দু'জনকেই আমি একবার দেখে নেবো!"

এই বলিয়া নরেন সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

বিকালবেলার এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা রতনের মনে বার বারই উদয় হইতেছিল। নরেন তখন তাহাদিগকে

শাসাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই শাসানি যে এত সাংঘাতিক ও এত শীগ্‌গির হইবে, রতন ইহা বিন্দুমাত্রও ভাবিতে পারে নাই!

কেবল তাহাই নহে। নরেন শুধু দীপককেই খুন করিল কেন? তাহার রতনকে ক্ষমা করিবার উদ্দেশ্যই বা কি? আসল বিবাদ তো রতনের সঙ্গে!

তবে?—

চারি

এক দুই করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল কিন্তু আসামী নরেন এখনও ফেরার—সে ধরা পড়িল না! পুলিশ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও, আসামীর কোন সন্ধানই করিতে পারে নাই!

ইতোমধ্যে রতন ও দীপকের সঙ্গে নরেনের যে বিবাদটা হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলেই বলিল, "খুনটা সত্যই রহস্যজনক; রতনকে খুন না করে দীপককে খুন করলো কেন?"

কিন্তু এই প্রশ্নটা বেশী দিন কাহারও বুকে সজাগ রহিল না —রহস্য ক্রমেই যেন পরিষ্কার হইয়া গেল! কারণ, একদিন

সকাল বেলা, ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই চারিদিকে এক দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িল! সকলেই শুনিল, রতনও আর বাঁচিয়া নাই—সে-ও খুন হইয়াছে!

দলে-দলে লোক আসিয়া স্কুল-বোর্ডিংএ ভিড় করিতে লাগিল। সকলের মুখেই প্রশ্ন, সকলের বুকেই কৌতূহল!

দেখা গেল, রতনের হত্যাকাণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, খুনীরা রতনের লাশটাকে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে!—

তাহার বিছানা ও বালিশ রক্তাক্ত, ঘরের মেজেয় চাপচাপ রক্ত জমাট্ বাধিয়া আছে, বিছানার কাছে দেয়ালে পর্য্যন্ত ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে! কিন্তু রতন কই?—খুনীরা তাহার লাশ পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই। বিছানা হইতে বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা রক্ত লাশের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে গিয়াছে:

পুলিশ আসিয়া অতি সাবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব-কিছু তথ্য সংগ্রহ করিল, তারপর বোর্ডিংএর ছেলে ও চাকর-বাকরদিগকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার পূর্ব্বে পুলিশ রতনের জিনিষপত্র খানাতল্লাস করিল। দেখা গেল, তাহার স্যুটকেস্—ভাঙ্গা, তাহার বইয়ের শেল্‌ফ্—ওলট্-পালট্ করা। মোট কথা, খুনীরা আসিয়া তাহার সব-কিছু তচ্‌নচ্ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রতনের বাক্সে যে দু'-একটি টাকা ছিল, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণই আছে!

রতন স্বভাবতঃই কিছু গরীব। কাজেই তাহার বাক্সে বেশী কিছু থাকা সম্ভবপর নহে। তবু, সেই সামান্য টাকা-পয়সাও দুর্ব্বৃত্তেরা কেহই ছোঁয় নাই, পুলিশ বিশেষভাবে এই জিনিষটাই লক্ষ্য করিয়া গেল!

একে তখন বড়দিনের ছুটির সময়, বোর্ডিং তখন প্রায় খালি। তাহাতে মাত্র তিন-চারি দিনের মধ্যে সেখানে উপর্য্যুপরি দুইটি খুন হওয়ায়, বোর্ডিংএর ছাত্র-মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

দীপক বোর্ডিংএর ছেলে নয় বটে, সে আসিয়াছিল রমেনের সঙ্গে দেখা করিতে। কিন্তু বাহির হইতে আসিলেও বোর্ডিংএই তাহার মৃত্যু হইল! আর রতন তো বোর্ডিংএরই ছেলে! মোট কথা, বোর্ডিংএর মাটিতেই দুই-দুইটি ছেলের রক্তপাত হওয়ায় সারা বোর্ডিংএ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল।

পুলিশের কাজ বাড়িয়া গেল শতগুণ। তাহারা পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে সব-কিছু অনুসন্ধান করিল; ঘটনাস্থলের ফটো তুলিয়া রাখিল; তারপর আসামী নরেনের ফটো দিয়া, তাহার নামে হুলিয়া বাহির করিল। মোট কথা, চেষ্টা করিল তাহারা কত রকমেই! কিন্তু আসামীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না! অবশেষে পুলিশের উৎসাহও ক্রমেই কমিয়া আসিল। ক্রমশঃ এমন হইল যে, বাহ্যতঃ সকলেই যেন এই জোড়া খুনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল! কিন্তু ভুলিতে পারিলেন না শুধু একজন; তিনি—ডিটেক্‌টিভ্‌ অশোক বসু।

সেদিনও প্রাতঃকালে তিনি কেবল এই জোড়া খুনের কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ইনস্পেক্টর মহিম সামন্ত খুব ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন, "শুনেছেন অশোক বাবু?"

—"আজ্ঞে না, কিছুই শুনিনি তো!" খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন অশোক বসু।

কিছু অপ্রস্তুত ভাবে মহিমবাবু কহিলেন, "শোনেন নি যে সে তো জানি! আর সেইজন্যই তো আমি এসেছি! খবরটা কি জানেন? বোর্ডিংএর সেই ১০ নম্বর ঘরে কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে।"

—"১০ নম্বর ঘর? মানে, সেই রতনের ঘর?"

—"হাঁ। এইমাত্র একটি ছেলে ও বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থানায় এসে এজাহার দিয়ে গেল!"

অশোকবাবু কথাটা খুব মন দিয়ে শুনলেন; তারপর বললেন, "কিন্তু ঘরখানা তালাবন্ধ করে বাইরে পুলিশ-পাহারা ছিল তো?"

—"হাঁ, সবই ছিল। কিন্তু স্যার, আপনিই তো বলেছিলেন, খুব কড়া পাহারার আর দরকার কি? শেলফ্-ভরতি কতকগুলো পুরাণো ছেঁড়া বই আর একটা ভাঙ্গা স্যুট্‌কেস্— ওতে আছেই বা কি? আমরা তো কিছুই পেলাম না!

কাজেই বাইরে পাহারা থাকতো বটে, কিন্তু তারাও আপনার অমন মন্তব্যের পর খুব হুঁশিয়ার থাকতো না—

সম্ভবতঃ অনেক সময় ঘুমিয়েই রাত কাটাতো। আর সেই সুযোগেই চুরিটা হয়ে গেছে।"

অশোকবাবু আবার একটুখানি কি ভাবিলেন! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, চুরিটা কখন্ হলো? আর কি কি জিনিষ খোয়া গেছে তা জানেন তো?"

—"হাঁ জানি, কিন্তু সে তো শোনাকথা মাত্র! এখনো যাইনি সেখানে—এইবার যাবো। তা' আপনিও যদি যান, মন্দ কি? সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস্ করতে এলাম!"

অশোকবাবু বলিলেন, "বেশ ভালোই করেছেন মিঃ সামন্ত! আমিও যাবো। আপনি তাহলে থানায় গিয়ে, আপনার দলবল নিয়ে তৈরী হোন্; আমি এখনই আসছি।"

—"আচ্ছা,—আপনি আসুন।" বলিয়া মহিমবাবু উঠিলেন ও বীরদর্পে বাহির হইয়া গেলেন।

ডিটেক্‌টিভ্ অশোক বাবুর মুখমণ্ডলে সহসা যেন একটা উজ্জ্বল আলোর ঢেউ খেলিয়া গেল! তিনি তখনই উচ্চকণ্ঠে কাহাকে ডাকিলেন, "পরীক্ষিৎ! পরীক্ষিৎ!"

—"যাই স্যার!" বলিয়া এক তরুণ যুবা তৎক্ষণাৎ পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

—"শুনেছ সব কথা পরীক্ষিৎ? না, ঘুমোচ্ছিলে?"

মৃদু হাসিয়া পরীক্ষিৎ কহিল, "না স্যার, আমি তো আপনার সাথে সাথেই জেগে বসে আছি! আপনার ঘরের সামান্য শব্দটিও আমার মাথার কাছে খুব বড় হয়ে শোনায়। কাজেই

আপনার নড়াচড়া, টেবিল-চেয়ারের খুট্‌খুট্ শব্দ,—সবই আমি বেশ স্পষ্টভাবেই শুনেছি। অত গোলমালের পর কি কেউ আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে? ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে আপনার যা কথা হচ্ছিল, সে কথাও আমি শুনেছি।”

—“বেশ! এখন তাহলে তৈরী হয়ে নাও, তুমিও আমার সাথে যাবে। আর শোনো, একটা জিনিষ নোট্ করে নাও তো পরীক্ষিৎ!”

—“বলুন স্যার!”

—“নোট্ করে নাও এই কথাটা। রতনকে যে খুন করেছে, সে টাকা-পয়সার লোভে করেনি। সে কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে—কি যেন খুঁজে বেড়ায়!”

—“আচ্ছা, মনে থাকবে, আমি নোট্ করে নিচ্ছি।”

—“বেশ, এখন তাহলে আমার দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে চটুপট্ বেরিয়ে পড়।”

পাঁচ

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ডিটেক্‌টিভ্‌ অশোক বসু যখন তাঁহার সহকারী পরীক্ষিৎকে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত।

ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়াই তিনি কহিলেন, "পরীক্ষিৎ! দু' কাপ চা আনতে বলো, আর ফিরে এসো এখনই।"

পরীক্ষিৎ বাহির হইয়া গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অশোকবাবু বলিলেন, "এখন তাহলে আরো কয়েকটা জিনিষ নোট করে নাও পরীক্ষিৎ! তার এক নম্বর হচ্ছে—রতনকে খুন করা হয়নি, তাকে চুরি করা হয়েছে; সে এখনো বেঁচে আছে।"

—"বেঁচে আছে?"

—"হাঁ, বেঁচে আছে। তা নইলে, কাল রাতে তার জুতো জোড়া এমন ভাবে উবে যেতো না! আর এ থেকে মনে হচ্ছে তাকে রাখা হয়েছে খানিকটা নজরবন্দী ভাবে, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে;—মানে, সে চলাফেরা করতে পারে, সে স্বাধীনতা তার আছে; কিন্তু ইচ্ছামত যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারে না, এইমাত্র!"

পরীক্ষিৎ বললে, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি ভুল

করছেন স্যার! জুতো জোড়া নেই দেখেই রতন বেঁচে আছে, এমন সিদ্ধান্ত কেমন করে হয়? চোর এসেছে চুরি করতে; পেলে না কিছুই, জুতোই নিয়ে গেল—এ রকম হতেও পারে তো? তারপর আর একটা কথা।

আপনি রতনের খুন আর এই চুরি—একই দলের কাজ বলে ধারণা করে নিয়েছেন। কিন্তু দুটো ব্যাপার আলাদা দলের দ্বারাও হতে পারে!"

অশোকবাবু চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটি দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, তারপর কহিলেন, "শোনো পরীক্ষিৎ, কেন আমি এসব সিদ্ধান্ত করেছি!

বোর্ডিংএর একটা ছোট্ট নোংরা ঘর—সে ঘরে একটা মানুষ খুন হয়েছে বলে সবাই জানে,—বিশেষতঃ বাইরে যার একটা সেপাই বসে আছে—ঘুমন্ত হলেও জ্যান্ত সে নিশ্চয়ই,—এমন ঘরে শুধু চুরির মৎলবে অন্য কোন চোর ঢুকবে কেন?

বলো তো, কি প্রলোভন সেখানে রয়েছে? রতন গরীব ছেলে। সেবারও বাক্স খুলে দেখা গেছে, সামান্য দু'-একটি টাকাই ছিল। তা ছাড়া, তার পুঁথি-পত্তর, বিছানা, ঘরের সাজসজ্জা—এসব দেখেও রতনের অবস্থা বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। মোট কথা, রতন দরিদ্র। তার গোটা-কয়েক কি জিনিষ-পত্তর ঘরের ভেতর আছে, বাইরে তার পুলিশ পাহারা,—এতটা সত্বেও সাধারণ ছিঁচ্‌কে চোর বা সিঁদেল্ চোর সেখানে যাবে কেন?

কাজেই একাজ করেছে এমন দল, যারা ঐ চোরদের চেয়ে একটু উঁচু দরের। তবে বলতে পার, পয়সার দিকে যখন তাদের লোভ নেই, তাহলে পুরানো জুতোই বা নেবে কেন?

তারও কারণ আছে, শোনো।—

রতন জীবিত আছে, একথা নির্ঘাত সত্য। তা নইলে তার জুতো জোড়া ওরা নিয়ে যেতো না। রতনকে তারা বাঁচিয়ে রাখলেও, একটা বন্দীর জন্য জুতো কিনে তারা মিছামিছি পয়সা খরচ করবে কেন? বিশেষতঃ নতুন জুতোর চেয়ে পুরানো জুতোয়ই আরাম বেশী। রতনের জুতো জোড়া যদি চুরি না যেতো, তাহলে সে জীবিত কি মৃত, আমার কোন সঠিক ধারণা হত না। কিন্তু জুতো জোড়া নেই দেখেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সে আজও বেঁচে আছে, আর জুতো ব্যবহার করতে পারে এমন ভাবে খানিকটা স্বাধীনতার ভেতর তাকে রাখা হয়েছে!”

পরীক্ষিৎ বেশ মনোযোগ দিয়া কথাগুলি শুনিয়া গেল। অশোকবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “শোনো পরীক্ষিৎ, এবার দু' নম্বর কথাটি শোনো।

দস্যুর দল রতনকে সরিয়ে নিয়ে কোথাও আটকে রেখেছে; কিন্তু তারা ব্যাপারটাকে খুন বলে সাজাতে চায়। কাজেই রতনের বিছানায় ও পথে-ঘাটে আমরা যে রক্তের ছড়াছড়ি দেখেছি, সেগুলি মানুষের রক্ত নয়, কোনো পশুর

রক্ত। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের কেমিষ্টও সেই রকম অভিমতই প্রকাশ করেছেন বলে শুনেছি।

আমার তিন নম্বর কথা হচ্ছে, ডাকাতের দল রতনকে সরিয়ে নিলেও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ তারা তখনো পায়নি। আর পায়নি বলেই রতনের ঘরে এসে এরা আবার হানা দিয়ে গেল! কিন্তু কি জিনিষের খোঁজে তারা এসেছিল, আর সে জিনিষ তারা পেয়েছে কিনা—কে জানে?

এখন ভাবো দেখি, কি এমন সেই জিনিষ, যার খোঁজে দু' দুবার ওরা এসেছিল?

টাকা-পয়সা নয়, সেকথা আগেই বলেছি। এবারও দেখলে, দামী কিছুই ওরা ছোঁয়নি! বইয়ের শেলফ্ ঘেঁটে, বইগুলো তচ্‌নচ্‌ করে গেছে—বইয়ের পাতাগুলো পর্য্যন্ত উল্‌টিয়েছে বলে মনে হয়।

পরীক্ষিৎ! এইখানেই আমার বড্ড গোল ঠেক্‌ছে! আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না যে, কি ওদের উদ্দিষ্ট জিনিষ!

যাহোক্ এইবার বলবো আমার চার নম্বর কথা! সে কথাটা খুব দরকারী ও মূল্যবান্। কথাটা হচ্ছে, যারা এই দলের লোক, তাদের খুব অবহেলার চোখে দেখ্‌লে চলবে না; তারা বেশ সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও ধনী। রতনের ঘরে তারা যে চুরি করতে এসেছিল, তখন তারা পায়ে হেঁটে আসে নাই,—তারা এসেছিল মোটর-গাড়ীতে চেপে।”

—"মোটর-গাড়ীতে ?"

—"হাঁ, মোটর-গাড়ীতে। শোনো পরীক্ষিৎ, তোমরা যতক্ষণ ঘরের ভেতর মহিম বাবুকে নিয়ে ছুটাছুটি করছিলে, আমি ততক্ষণ ঘরের বাইরে, তার আশে-পাশে, চুল-চেরা অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত ছিলাম।

সেই অনুসন্ধানে আমি বুঝে নিয়েছি, ছোট্ট একখানি মোটর-গাড়ী বোর্ডিংএর খানিকটা দূরে, মাঠের ভেতর বটগাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে যাবার সময়, আরোহীরা গাড়ীর চাকার দাগগুলো পুঁছে দেবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পারেনি। আমি সেখানে তাদের সম্বন্ধে আরো কতকগুলো অনুসন্ধানের সূত্র পেয়েছি বটে, কিন্তু সেগুলো এখন ইচ্ছে করেই গোপন রেখে যাচ্ছি—তোমাকেও এখন বলবো না।

মোট কথা, এইটুকু জেনে রাখো পরীক্ষিৎ, আমাদের বিপক্ষ খুব দুর্ব্বল নয়। কাজেই তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে যে-কোন সময় বিপদ্ আসা অসম্ভব নয়! তা মনে রেখে, খুব সাবধানে কাজ করে যাবে পরীক্ষিৎ! কিছুতেই যেন কোন ভুল না হয়!

আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—রতন ছেলেটা আজও বেঁচে আছে! কাজেই তাকে উদ্ধার করবার সঙ্কল্প আমাদের অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখতে হবে—কিছুতেই আমাদের হতাশ বা পশ্চাৎপদ হওয়া চলবে না।

তুমি বুদ্ধিমান্ ও সাহসী, এর বেশী তোমাকে বলা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যাও পরীক্ষিৎ, এখন তুমিও তোমার কর্ত্তব্যগুলো একবার ভাল করে ভেবে নাও—আজ রাত এগারোটা থেকেই আমাদের কাজ সুরু হবে। তখন একবার আমাদের বেরুতে হবে। আমরা প্রথমে যাব বোর্ডিং পেরিয়ে শ্যাম-দীঘির পথে।"

অশোকবাবু এই বলিয়া ইজি-চেয়ারে তাঁহার দেহখানি এলাইয়া দিলেন, আর পরীক্ষিৎও নীরবে—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

অন্ধকার গভীর রাত।

দূরে কোথায় ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে কালো রঙের একখানি ঘোড়ার গাড়ী, ডিটেক্‌টিভ্ অশোক বসুর বাড়ী হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীর দরজা-জানালা সবই বন্ধ; ভিতরে আরোহী কে, বা কতজন, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বোর্ডিং পার হইয়া শ্যাম-দীঘির পথে খানিকটা যাইতেই গাড়ীর দরজা-জানালা সবগুলি খুলিয়া গেল; ভিতরে দুপাশের সীটে আরোহী দু'জনের সাদা পোষাক সেই অন্ধকারেও ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল!

গাড়ীখানি আর মাত্র এক মিনিট গিয়াছে, এমন সময় সহসা

গাড়ীর দু'পাশ হইতে সশব্দে পিস্তলের গুলি ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর আরোহীদের দেহে বিদ্ধ হইল ! কোচম্যান্ ভয় পাইয়া "ডাকু, ডাকু," বলিয়া কোচবক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল ! এই সুযোগে অন্ধকার গাছতলা হইতে দুইটি বলিষ্ঠ লোক গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিল।

কিন্তু গাড়ীর কাছে আসিয়াই তাহারা চমকিয়া উঠিল। এ কি ! তাহারা গুলি করিয়াছে কাহাকে ? গাড়ীর মধ্যে লোকজন কেহই নাই, কেবল দুপাশের সীট্ দুটিতে সাদা কাগজে মোড়া দুটি কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে ; অন্ধকারে দূর হইতে তাহাই দুটি লোকের দেহ বলিয়া মনে হইতেছিল !

লোক দু'জন একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তকাল কাহারও মুখ হইতে কোন কথা ফুটিল না ; কিন্তু পরক্ষণেই, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি একটু কথাবার্ত্তা হইল, এবং তারপর গাড়ীখানিকে বাঁ-দিকে ফেলিয়া উভয়ে ছুটিয়া এক আম-বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল !

গাঢ় অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই ! কিন্তু সে মাত্র আধ মিনিট। তারপর জমাট অন্ধকারের মত দুটি প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধীরে কোথা হইতে সেইখানে উদয় হইল ! তাহাদের আপাদ-মস্তক কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে আচ্ছাদিত—প্রত্যেকেরই এক হাতে রিভলভার, অপর হাতে টর্চ্চ।

তাহাদের একজন কহিল, "দেখলে পরীক্ষিৎ! ওরা এবার আমাদের ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে!"

পরীক্ষিৎ কহিল, "হাঁ, সে তো বুঝলুম; কিন্তু বুঝতে পারছি না ওরা কেমন করে জানলে যে এই শ্যাম-দীঘির দিকেই এত রাতে বেড়াতে আসব!"

মৃদু হাসিয়া ডিটেক্‌টিভ্‌ অশোক বসু বলিলেন, "পরীক্ষিৎ! তুমি এতদিন আমার সাথে আছ বটে, কিন্তু পদে-পদে বোকামির পরিচয় দাও কেন বল দেখি?

তোমার ও আমার মাঝে যখন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, এখানে আসব বলে আমি যখন তোমাকে তৈরী হতে বলছিলাম, আমি তখন ভাল করেই জানতাম যে, ওদের কোন গুপ্তচর নিশ্চয়ই আমাদের কথাগুলো ওৎ পেতে শুনে নিচ্ছে! ওরা যত সাবধানই হোক্‌ না কেন, ওদের পায়ের অতি মৃদু খস্‌খসানি শব্দও আমার কানে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। কাজেই অত স্পষ্ট করে আর অত জোরে তোমাকে আমি কথাগুলো বলছিলাম!

কিন্তু ওরা তখন ভাবতেও পারেনি যে, আমি ঐ কথাগুলো বলেছিলাম কেবল ওদের ভুল পথে চালাবার জন্যই! স্কুল-বোর্ডিং বা শ্যাম-দীঘির আশে-পাশে আমার আর খোঁজ করবার কি থাকতে পারে? কিছুই নেই। তবে এমন একটা ভড়ং করেছিলাম, যেন ওদের সম্বন্ধে কত কি আমার জানা হয়ে গেছে! এমন একটা সুযোগ কি ওরা বৃথা যেতে দিতে

পারে? কাজেই ওরা আমাদের হত্যার জন্য এক আয়োজন করেছিল। আমিও তাই দুটো কাঠের গুঁড়িকে সাদা কাগজে মুড়ে গাড়ির ভেতর বসিয়ে দিই আর কোচম্যান্‌কে কিছুই না জানিয়ে বাড়ী থেকে একখানা বন্ধ গাড়ী বার করে দিই।

কিন্তু কোচম্যানের হাতে একগাছা সরু তার দিয়ে তাকে বলে দিয়েছিলাম যে, শ্যাম-দীঘির এই জায়গাটায় গাড়ী এলে, সে যেন আমাদের জানাবার জন্য তারটা টেনে দেয়।

আসলে তারটার সঙ্গে এমন একটা কৌশল করেছিলাম যে, তারটা সে টেনে দিলেই গাড়ীর দরজা-জানালা খুলে যাবে। হলোও ঠিক্ তাই। তারপর দরজা-জানালা খুলে যেতেই, অন্ধকারে কাঠের গুঁড়ি দুটোই ওদের কাছে মানুষ হয়ে দাঁড়ালো, আর ওরা চালিয়ে বসলো গুলি!

কিন্তু গাড়ীর কাছে ছুটে এসেই ওরা বুঝলে যে, আসলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিষম ধাপ্পা মাত্র—হয়তো কোনো ষড়যন্ত্র এর পেছনে লুকিয়ে আছে! কাজেই চট্ করে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া ওদের আর কি উপায় থাক্‌তে পারে?"

পরীক্ষিৎ বলিল, "কিন্তু স্যার, এখন কি করবেন বলুন! কোচম্যান পালিয়েছে, ঘোড়াটাও চমকে উঠে ছট্‌ফট্ করছে! গাড়ী এখন আমরাই চালিয়ে নেবো, না এখানেই পড়ে থাকবে?"

অশোক বাবু বলিলেন, "গাড়ী এখানেই পড়ে থাকবে পরীক্ষিৎ! বরাতে যদি থাকে, তাহলে এই গাড়ীখানাই

হয়তো আরো কিছু অনুসন্ধানের সূত্র জুটিয়ে দেবে। কাজেই গাড়ী আজ এখানেই থাকবে, তবে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দাও। ওরা বাড়ী চিনে বাড়ীতে ফিরে যাবে।"

পরীক্ষিৎ তাহাই করিল; তারপর অশোক বাবুর উপদেশ অনুসারে, রাস্তা হইতে মাঠে নামিয়া পড়িল এবং মাঠের পথে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যাইতে যাইতে পরীক্ষিৎ বলিল, "আচ্ছা স্যার! একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, আমার অপরাধ নেবেন না।"

—"বলো।"

—"আমার কথাটা হচ্ছে, আপনি এই যে কাজটা করলেন—মানে, শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিলেন আমরা শ্যাম-দীঘিতে যাচ্ছি, তারপর বন্ধ গাড়ীর ভেতর নকল মানুষের পরিকল্পনা ইত্যাদি,—এতে আমাদের লাভ হলো কতখানি? আমার মনে হচ্ছে, উল্টে ওরাই তো আমাদের কাজকর্ম্ম ও চিন্তা-ধারার একটা ধারণা নিয়ে গেলো!"

একটু হাসিয়া অশোক বাবু বলিলেন, "শোনো পরীক্ষিৎ, কেন আমি এ পথে পা বাড়িয়েছি!—

তোমার মনে আছে দীপক খুন হয়েছে পিস্তলের গুলিতে; কিন্তু রতন খুন হয়ে থাকলেও পিস্তলের গুলিতে হয় নি; কোন শব্দ শোনা যায়নি। এ থেকে এমন একটা সন্দেহ হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয় যে, দীপক ও রতনের ব্যাপার হয়তো একই দলের কাজ নয়! কিন্তু মনে রেখো

পরীক্ষিৎ, তোমার সঙ্গে আমার যখন কথা হচ্ছিল, তখন প্রধানতঃ রতনের কেসটার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। রতন যে আজও বেঁচে আছে, আমি তোমাকে সে কথাটাই বলছিলাম!

আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার এই ধারণাটা যেন সমস্ত যুক্তি শুদ্ধ, বিপক্ষের লোকেরাও জানতে পারে।

কাজে হলোও ঠিক তাই। ওরা বুঝে নিলে যে, রতন যে বেঁচে আছে তা আমি জেনে ফেলেছি! আর ওরা যে মোটর-গাড়ীতে এসেছিল, তাও আমি বুঝে নিয়েছি! এমন কি, ওরা যে টাকার লোভে রতনকে সরায়নি, এখনো অন্য কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে খবরও আমি জানি!

এতটা খবর আমি জানি, এ অবস্থায় ওরা কি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? কাজেই ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তা আরো ভাল রকম জানবার জন্য আমি ইচ্ছা করেই, আমাকে যেন আক্রমণ করতে পারে এই সুযোগ দেওয়ার অভিপ্রায়ে শ্যাম-দীঘির কথা ওদের জানিয়ে দিই, ও সে-পথে পা বাড়াই।

এখন ভাবো দেখি, এই ব্যাপারে আমরা আর কি জানতে পারলাম?—

এক নম্বর হচ্ছে—বিপক্ষের দল সত্যিই আমাকে হত্যা করতে চায়; কারণ, আমি যেটুকু ধারণা করেছি, সেটুকুই ওদের পক্ষে মারাত্মক।

দু'নম্বর হচ্ছে—এদের দলে কেবল একটা নয়, একাধিক

পিস্তল রয়েছে; অর্থাৎ এরা একটা সঙ্ঘবদ্ধ ডাকাতের দল। কেবল ব্যক্তিগত কারণেই রতনের পেছনে এরা লাগেনি, অন্য কোন কারণ আছে।

তিন নম্বর হচ্ছে—দীপকের হত্যাকাণ্ডের যারা নায়ক, রতনকে চুরি করার কাজও তাদেরই দ্বারা হয়েছে; অর্থাৎ, দুটোই এক দলের কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া আরো একটা জিনিষ আমি পেলাম। আমার মনে হচ্ছে, দীপককে হত্যা করার তেমন কোন কারণ ছিল না। সে কারো নাম বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই নাম বলাটা ওরা বন্ধ করে দিলে; তা ছাড়া, খুন করার সম্ভবতঃ আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রতনের ব্যাপারে বোধ হয় ওদের বিশেষ কোন স্বার্থ জড়িত রয়েছে। তাকে একদম্ মেরে ফেললে সেই স্বার্থ সিদ্ধ হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না— তাকে বাঁচিয়ে রেখে এখানে-ওখানে অনুসন্ধান করলে হয়তো স্বার্থ পরিপূর্ণ হতে পারে। কাজেই আমার এই ধারণা হয়েছে পরীক্ষিৎ, দীপক ও রতনের ব্যাপার দুটো একই দলের কাজ হলেও, দুজনের সম্বন্ধে তাদের স্বার্থ বিভিন্ন।"

পরীক্ষিৎ খুব মন দিয়া অশোকবাবুর কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিল, "কিন্তু স্যার, এখন এমন অবস্থায় আমার এসে পড়েছি যে, আমাদের আর লুকোবার উপায় রইলো না। আমরা যে ওদের পরম শত্রু, একথা ঢাক পিটিয়ে আমরাই ওদের জানিয়ে দিলুম।

কিন্তু সম্ভবতঃ এ জিনিষটা আমরা গোপন রেখেও কাজ করে যেতে পারতাম।”

—“হাঁ, সেকথা ঠিক। কিন্তু ওতে আমরা যেমন গোপন থাকতাম, ওরাও তেম্‌নি গোপন থেকে যেতো চিরকাল; ওদের কোন খোঁজ-খবরই আমরা পেতাম না। এতে আমাদের বিপদের ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু ওদেরও ধরা পড়বার সম্ভাবনা হয়েছে।”

অশোকবাবু একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “শোনো পরীক্ষিৎ, আর একটা কথা শোনো।

দীপক ও রতন দু'জনেই গ্রামের ছেলে, দুটো ঘটনাই হলো ছোট্ট এক গ্রামের ভেতর। এখন সেই কাজিরপাড়া গ্রামের পুলিশের মারফৎ কেস্‌টা এই সাব্‌-ডিভিশনেল্‌ সহর প্রতাপগড়ের ডিটেক্‌টিভ্‌-ডিপার্টমেণ্টে এসে পড়েছে।

কেসের তদন্ত-ভার এতটা দূরে এলেও আসামীরা কোথায় তা আমরা জানি না। তারা গ্রামেরই কেউ, না কোন দূর-দেশের লোক,—সে সব কিছুই আমাদের জানা নেই। তাহলে আসামীদের গ্রেপ্তার করবো কেমন করে?

এই অসুবিধা বুঝতে পেরেই আমাকে এমন একটা পন্থা বেছে নিতে হলো, যাতে আসামীদের দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ থাকে, তারাই যেন অবিরত আমাদের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়ায়; তার মানেই হচ্ছে, বিপদ্‌কে কাছে ডেকে নিয়ে আসা। আমি তাইই করেছি পরীক্ষিৎ! আমিই নিজে

থেকে এমন একটা ভান করেছি, যাতে ওরা বুঝে নেয় যে, আমি ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি, কেবল গ্রেপ্তার করাই বাকি!

কাজেই যারা দূরে ছিল বা দূরে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারত, তারা আজ স্বেচ্ছায় কাছে এসেছে এবং আত্মপ্রকাশও করে ফেলেছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হবে,—ওরা কাছে আসে আসুক, কিন্তু ওদের কোন অনিষ্ট করতে দেবো না; আর একটু বাঁকা দৃষ্টি রেখে ওদের আস্তানাটা কোথায় তার অনুসন্ধান করে যাব। একবার ওদের আড্ডা কোথায় তা যদি জানতে পারি, তাহলেই রতনের খোঁজ পাব,—আর কি যে ওদের উদ্দেশ্য, হয়তো তাও জানতে পারব।

যাক্, কথা কইতে কইতে আমরা প্রায় বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি। আশা করি তুমি আমার কর্ম্ম-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ করবে না!"

পরীক্ষিৎ লজ্জিত হইল। সে কহিল, "না স্যার, অভিযোগ আর কি! বুঝতে পারছিলাম না, তাই আপনাকে এত সব— ও কি! ও কি স্যার? ঐ দেখুন, দোতলা বাড়ীর সমান উঁচু নদীর জল আমাদেরই দিকে—"

"তাই তো! কি এ! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!—

কে কোথায় নদীর ধারে বাঁধ কেটে দিয়েছে—তারই ফলে গোটা গ্রামখানি আজ মুহূর্ত্ত-মধ্যে উচ্ছন্নের পথে ভেসে যাচ্ছে!"

পরীক্ষিৎ শিহরিয়া উঠিল ; সে একবার অশোকবাবুর দিকে তাকাইল, আর একবার ঐ পর্ব্বত-প্রমাণ জলের দিকে তাকাইল।

কিন্তু অন্ধকারে তখনো জলের হিংস্র মূর্ত্তির অপেক্ষা তাহার হিংস্র গর্জ্জনই তাহাকে বিচলিত করিল বেশী।

অশোকবাবুও একবার ঐ জলস্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরক্ষণেই বিপরীত দিকে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে কহিলেন, "দৌড়ে এসো পরীক্ষিৎ! আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করো না। পার যদি ঐ তালগাছটার ওপর উঠে পড়।"

বলিলেন বটে, কিন্তু তখন আর সময় কই? ক্ষুধিত সিংহের মত বিষম গর্জ্জন করিয়া, এক বিরাট মহা-সমুদ্র যেন প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল!

সে শক্তি ও বিক্রমের কাছে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতাই অতি তুচ্ছ প্রমাণিত হইল—অশোকবাবু কোথায় গেলেন, পরীক্ষিৎই বা কোথায় গেল, পৃথিবীর অপর কেহই তাহা জানিতে পারিল না! প্রবল জলস্রোতে তাঁহারা কোথায় ভাসিয়া গেলেন!

সাত

ডিটেক্‌টিভ্‌ অশোক বসু বিগত কয়েক ঘণ্টার কথা আবার মনে করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সুদীর্ঘ দু'তিন ঘণ্টা জলে ভাসিবার ফলে তাঁহার মস্তিষ্ক তখনও অসাড়, দেহ অনড় ও নিস্পন্দ।

একটা কাতর শব্দ করিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও অতি কষ্টে একবার ডাকিলেন, "হারাধন!"

শুধু হারাধন মাঝির নামটাই তাঁহার তখন মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল; কারণ, জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি কেবল হারাধন ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও ভাই কয়েকটিকে দেখিয়া আসিতেছিলেন! হারাধনের সেবা-শুশ্রূষায় তিনি ক্রমশঃ বললাভ করিতেছিলেন।

হারাধন ছুটিয়া আসিল, তারপর মহাব্যস্ত ভাবে কহিল, "কি বাবু, আমায় ডাকছেন কেন? কিচ্ছু ভাববেন না, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।"

মিনিট খানেক অশোকবাবু আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার কণ্ঠ হইতে আবার কথা ফুটিল, "আমি কোথায় আছি হারাধন? আর তোমরা কোথায় আমাকে পেলে?"

হারাধন কহিল, "কর্ত্তা, আপনি আপনার নিজের বাড়ীতেই আছেন। আমার এই বাড়ী-ঘর সবই তো আপনার কর্ত্তা! আমরা গরীব নিকারী—মাছ ধরে খাই। কাজেই আপনার উপযুক্ত যত্ন করতে পারছি না। তা যাক্, আমি আপনার অবস্থা জানিয়ে কাজিরপাড়া থানায় খবর পাঠিয়েছি—দারোগা-বাবু এলেন বলে! তারপরেই আপনি আপনার বাড়ী যেতে পারবেন কর্ত্তা! আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।"

হারাধনের কথায় অশোকবাবু বিস্মিত হইলেন। তিনি কহিলেন, "তোমরা থানায় খবর পাঠালে কেন? আমি কে, তা জানো?"

—"তা আর জানি না কর্ত্তা? যে সাঁওতালটি আপনাকে জল থেকে তুলে এনে আমার হাতে দিয়ে যায়, সে লোকই তখন বলেছিল যে আপনি পুলিশের একজন বড় কর্ত্তা, খুবই বিপদে পড়েছেন। সে বলেছিল, আপনি একটু সুস্থ হলে, আমি যেন থানায় খবর পাঠিয়ে দেই।

আর একটা কথা সে বলেছে। সে বলেছে, আপনার জামার বুক-পকেটে নাকি খুব জরুরী একখানা কাগজ আছে। আপনি সুস্থ হলে যেন কাগজখানা আপনাকে দেওয়া হয়।

ভিজে জামা তো আর আপনার গায়ে রাখতে পারি নাই কর্ত্তা, খুলে রেখেছি। কাগজখানাও তাতে রয়েছে। আমি জামাটা শুদ্ধ এনে দিচ্ছি। কি জানি, আমি আবার কখন ভুলে যাই!"

বলিয়াই আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বাহির হইয়া গেল এবং মাত্র মিনিটখানেক পরেই সে অশোকবাবুকে তাঁহার জামাটি আনিয়া দিয়া বলিল, "এই নিন আপনার জামা। পকেটে কাগজখানি এখনো খচ্‌খচ্‌ করছে!"

অশোকবাবু বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! হারাধনের কিছু কথা তিনি বুঝিলেন, কিছু বা একেবারেই বুঝিলেন না! এক সাঁওতাল তাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, তিনি যে পুলিশের লোক তাহা সে বলিয়া গিয়াছে, জামার পকেটে কি এক দরকারী কাগজ আছে তাহাও সে জানে,—এসব কি? কে এই সাঁওতাল? কি তাহার পরিচয়?—

এসব কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি জামার বুক-পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিলেন। দেখিলেন, অতি ছোট একখানি হলদে রঙের কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা :—

মাননীয় মিঃ বোস!

আমি বড়ই দুঃখিত যে, আপনার মত বুদ্ধিমান লোকও শত্রুর কৌশলে এমন ভাবে বিপন্ন হয়! যাহোক্, একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আপনার সহকারী পরীক্ষিৎ বাবুকে আপনাদের শত্রুপক্ষ জল থেকে তুলে নিয়ে গেছে। কাজেই তিনি এখন শত্রুর হাতে। আপনি জয়লাভ করুন এই আমার কামনা। ইতি—

হিতৈষী
সাঁওতাল।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে অশোকবাবুর মুখমণ্ডল বিবর্ণ

হইয়া গেল। ভাবিলেন, "তাইতো, এতক্ষণ পরীক্ষিতের কথা আমার মনেই হয় নাই! কি সর্ব্বনাশ!"

অশোকবাবু আর ভাবিতে পারিলেন না। তিনি বিষম উত্তেজিত ভাবে উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, "হারাধন! আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আমার এক পরম বন্ধুকে ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি যাব—এখনই যাব হারাধন! তুমি আমায় ধরে বসাও তো একবার! তারপর দয়া করে আমাকে এখনই কাজিরপাড়া বা প্রতাপগড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি আর দেরী করতে পারছি না হারাধন!—তুমি যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে—"

বাধা দিয়া হারাধন কহিল, "আপনি এ কেমন কথা বলছেন কর্ত্তা? আমি আপনার যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। আমার প্রকাণ্ড ছিপ-নৌকোয় ষোলজন দাঁড়ী আপনাকে বেয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনি আগে একটু শক্ত হোন কর্ত্তা, তবে তো যাবেন! আপনি—"

—"না, না, আমি তোমাদের কোন কথা শুনতে পারব না হারাধন! ওরা আমার পরীক্ষিৎকে নিয়ে গেছে, আমি তাকে উদ্ধার করবই। কই, তোমাদের দারোগাবাবু যে এখন পর্য্যন্ত এলেন না হারাধন!—"

সহসা বাহিরে কতকগুলি পায়ের শব্দ হইল। সেই শব্দ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই ধপ্ করিয়া ঘোড়া হইতে নামিলেন—ইন্‌স্পেক্টর মহিম সামন্ত!

—"এই যে আমি এসেছি মিঃ বোস্!"—বলিতে বলিতে তিনি সেই ছোট্ট কুটীরখানিতে তাঁহার বিশাল দেহটি প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

—"আপনি এসেছেন? আঃ, আপনি বাঁচালেন!" বলিয়া অশোকবাবু আর-একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ তখনই আবার পড়িয়া গেলেন।

অশোকবাবু হল্‌দে কাগজের চিঠিখানি মহিমবাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, "এই দেখুন মহিমবাবু, আমার কি মহা সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আমার পরম বিশ্বাসী অকপট বন্ধু পরীক্ষিৎ এখনো বেঁচে আছে কিনা কে জানে?"

মহিমবাবু চিঠিখানি পড়িলেন,—একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহারও দম বন্ধ হইয়া আসিল! সংক্ষেপে তিনি কহিলেন, "তাহ'লে এখন কি করা যায়?"

—"কি করা যায়? সে আমি দেখব। কিন্তু আমায় আগে প্রতাপগড়ে নিয়ে চলুন, একটু সুস্থ করে তুলুন মহিমবাবু!—"

অশোকবাবুর কণ্ঠে মিনতি, প্রাণে ব্যাকুলতা!

মাত্র আধঘণ্টা পরেই যখন ষোলজন দাঁড়ী-মাঝি হারাধনের বড় ছিপ-নৌকায় পুলিশ-বাহিনীসহ অশোকবাবু ও দারোগা-বাবুকে লইয়া প্রতাপগড়ের দিকে রওনা হইল, সুখচরের নদীতীরে তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকজন আসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

এ গাঁয়ের সৃষ্টি অবধি এত বড় তামাসা আর কখনও হয় নাই, একথা গ্রামের বৃদ্ধেরাও জোর গলায় ঘোষণা করিল।

আট

কয়েক দিন পরের কথা।—

রাত্রি গভীর, এইমাত্র কোথায় দুইটা বাজিয়াছে! পাড়ার সমস্ত অধিবাসী এখন নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সারা কলিকাতাই এখন সুখসুপ্ত ও নিঃস্তব্ধ! এমন সময় একখানি মোটর-গাড়ী সশব্দে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ক্রীক্ লেনের মোড়ে আসিয়া থামিল!

পাঁচটি বলিষ্ঠ লোক গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। তাহারা সকলেই সশস্ত্র, দুইজনের হাতে রিভলভার ও টর্চ্চ।

সম্মুখের লোকটি তাহার পকেট হইতে একখানি খবরের কাগজের কিয়দংশ বাহির করিয়া টর্চ্চের আলোয় একবার তাহা পড়িয়া লইল, তারপর পশ্চাতের বন্ধুদিগকে কহিল, "চল, ১নং ক্রীক্ লেন। সম্ভবতঃ কাছেই কোথাও হবে।"

এক সুউচ্চ দোতলা বাড়ী—১নং ক্রীক্ লেন; মোড়ের বাড়ীটা ছাড়াইলে, ডানহাতে প্রথমে যে বাড়ীটা পড়িবে তাহাই ১নং ক্রীক্ লেন। আগন্তুক দল ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটিয়া, সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটকেই বাড়ীর অধিবাসীর নাম লেখা—আর. রায়।

বাড়ীটার পশ্চিম দিক্ দিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে

একটি গলি-পথ ধর্ম্মতলায় যাইয়া মিশিয়াছে। আগন্তুকদিগের একজন বাড়ীর উত্তর দিকে সদর দরজায় দাঁড়াইল, অপর সকলে পশ্চিমের ঐ গলি-পথে কয়েকবার চলাফেরা করিয়া, বাড়ীতে ঢুকিবার প্রবেশ-পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দেখা গেল, পশ্চিমের জানালাগুলির মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। পুরাতন লোহার শিকগুলির বদলে সেখানে কাঠের ফ্রেম বসানো হইয়াছে।

জানালার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইতে তাহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। একটি থলি হইতে একখানি করাত ও অপর একটি যন্ত্র বাহির করিয়া, তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জানালার ফ্রেমটি খুলিয়া ফেলিল; তারপর একবার মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য সারা ঘরে টর্চ্চের আলো বুলাইয়া লইয়া পরক্ষণে একজন সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উত্তর দিকের দরজাটি খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিয়া দিলে দলের একজন ব্যতীত অপর সকলেই নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল, একজন শুধু সদর দরজায় পাহারা দিতে লাগিল।

ঘরের মধ্যে একটি বিছানা। সেই বিছানায়, মশারির নীচে কেহ নিদ্রিত। আগন্তুকদিগের একজন রিভলভার হাতে তাহার পাহারায় নিযুক্ত রহিল। অপর সকলে এখানে-সেখানে জিনিষ-পত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সহসা একটি স্যুটকেশ দেখিয়া একজনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল—সে স্যুটকেশটি তুলিয়া লইয়া অপর সঙ্গীদের দেখাইল। সকলেই দেখিল, স্যুটকেশের উপরে নাম লেখা—'রতন সরকার'।

আর কি! যাহা তাহারা খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে; কাজেই আর বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?—তাড়াতাড়ি তখনই তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু অনেক সময় মৃদু খস্‌খসানি শব্দেও নৈশ নীরবতা ভাঙিয়া যায়! আগন্তুকদিগের এত সাবধানতায়ও বাড়ীর কেহ কেহ জাগিয়া উঠিল—তৎক্ষণাৎ কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে? কে?"

ঘরের মধ্যে যে এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল, সেও জাগিয়া উঠিল এবং সজোরে হাঁকিল, "কে রে? কৌন্ হায়?"

দেখিতে দেখিতে সারা বাড়ীতে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল—কর্ত্তার দল উপর হইতে নীচে ছুটিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছিল, ইহা বুঝিতে কাহারও দেরী হইল না; কারণ, দেখা গেল, ঘরের একটা জানালা একেবারেই খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, ঘরের দরজাও একেবারে খোলা।

দস্যুদের গমন-পথ লক্ষ্য করিয়া, একজন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে দুইবার ফাঁকা আওয়াজ করিল—দস্যুদের পক্ষ হইতেও তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল; অর্থাৎ দস্যুরাও পাল্টা বন্দুকের আওয়াজে বুঝাইয়া দিল যে, পেছনে ছুটিয়া

লাল দালন—

এক বিরাট মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বেগে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

[পৃঃ ৪০

আসিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী! কাজেই, বাড়ীর কেহই আর তাহাদের অনুসরণ করিল না। তথাপি দস্যুরা প্রাণপণ বেগে মোটরে উঠিয়াই ষ্টার্ট দিল—তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে গাড়ীখানি বায়ুবেগে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ পার হইয়া, চৌরঙ্গির উপর দিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিল।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; সহসা আরোহীদের একজন গাড়ীর দক্ষিণ ফুটবোর্ডে কি একটা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! সে তাড়াতাড়ি চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিল।

গাড়ী থামিলে দেখা গেল, ফুটবোর্ডের উপর কাপড়ের পুঁটুলীর মত কি একটা জিনিষ পড়িয়া আছে! কিন্তু একজন কাছে যাইয়া তাহা স্পর্শ করিতেই, সে মহা বিস্ময়ে কহিল, "আরে এ যে মানুষ দেখছি! একটা মেয়ে মানুষ!"

অবশেষে সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিল সে একজন ভিখারিণী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ধর্ম্মতলায় ঘোড়ার গাড়ীর ধাক্কায় সে আহত হয়। তারপর সে তাহাকে কোন একটা হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কত বাবুকে, কত গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিয়াছে! কিন্তু কেহই তাহার প্রার্থনায় কান দেয় নাই। এই গাড়ীখানি খালি দেখিয়া সে চুপিচুপি তাহাতে উঠিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহার একান্ত অনুরোধ, তাহাকে কোন হাসপাতালের দরজায় নামাইয়া দেওয়া হউক।

ভিখারিণীর বুদ্ধি ও অনুরোধে সকলেই "হো-হো" করিয়া

হাসিয়া উঠিল। একজন ভাঙা বাংলায় কহিল, "আ মলো হতভাগী! আমরা যাচ্ছি টালিগঞ্জ, তোকে নামিয়ে দেবো হাসপাতালে! হাসপাতাল কোথায় রে? মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তো সেই কলেজ ষ্ট্রীটে—আমাদের উল্‌টো দিকে!"

একজন বলিল, "আরে দূর বোকা! এদিকেও যে একটা হাসপাতাল আছে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল! এই ফাঁসির মড়াটাকে চল্ সেইখানে নামিয়ে দিয়ে যাই! আর গালমন্দ করে লাভ কি? দেখ্‌ছিস্ না বুড়ীর পা আর কাপড়-চোপড় রক্তে লাল হয়ে গেছে। চোট্‌টা নিশ্চয়ই খুব জোর লেগেছে! চল্, এটাকে নিয়ে যাই,—পথে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইল, গাড়ী আবার নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। তারপর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের সামনে ভিখারিণীকে নামাইয়া দিয়া একজন কহিল, "এখন এখানে বসে থাক্ হতভাগী! হাসপাতালের কাউকে দেখলে ভেতরে যাস্—ডাক্তার দেখাস্—তাহলেই ওষুধ পাবি।"

মোড় ফিরিয়া গাড়ী আবার সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিল।

আরোহীরা সকলেই তখন তাহাদের কোন্ এক বাঞ্ছিত জিনিষ লাভ করিয়া আনন্দে উদ্বেল! নতুবা, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে এবং অধিকতর সতর্ক ও মনোযোগী থাকিলে তাহারা দেখিতে পাইত যে, গাড়ী মোড় ফিরিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিখারিণী যেন মন্ত্রবলে এক সুবেশ যুবায় পরিণত হইয়া

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! আর কেবল তাহাই নহে, ঐ গাড়াখানির অনেকটা পশ্চাতে থাকিয়া অপর একখানি মোটর-গাড়ী তাহাকে অতি সাবধানে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল!

কে এই ভিখারিণী-বেশী যুবা? আর কে ঐ অনুসরণকারী গাড়াখানির আরোহী?

নয়

পরদিন সকাল বেলা—ক্যালকাটা পুলিশের ইনস্পেক্টর রবি রায়ের নিজস্ব বাড়ী ১নং ক্রীক্ লেনেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

ডিটেক্‌টিভ্ অশোকবাবু বলিলেন, "তাহলে রবি, তুমি স্বীকার করছ যে, আমার প্ল্যান্‌টা একেবারেই বাজে নয়?"

—"বলো কি হে? কাজ তো প্রায় গুছিয়ে এনেছ! এমন অবস্থায় তোমার প্ল্যান্‌কে বাজে বলতে কেউ সাহস পায়? দেখি তো মহিমবাবু, আপনাদের বিজ্ঞাপনটা আর-একবার দেখি।"

ডিটেক্‌টিভ্ অশোকবাবু কলিকাতা আসিবার সময় সেই গ্রাম্য ইন্‌স্পেক্টর মহিম সামন্তকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পকেট হইতে একখানি ভাঁজ-করা খবরের কাগজ বাহির করিয়া রবিবাবুর হাতে দিলেন।

কাগজখানি "দেশবার্ত্তা"। তাহারই "ব্যক্তিগত" হেডিংএর নীচে অবিনাশ গুপ্ত নামে একজন লোক রতন সরকারকে সম্বোধন করিয়া একখানি চিঠি প্রকাশ করিয়াছে। আসলে, অবিনাশ গুপ্ত একটি কল্পিত নাম মাত্র—ডিটেক্‌টিভ্ অশোক-বাবুই এই চিঠিখানির জনক।

রবিবাবু সেই ছাপানো চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"ভাই রতন! তোমাকে দু'খানা চিঠি লিখেও কোন জবাব না পেয়ে, অবশেষে খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

মাস-কয়েক আগে কলকাতায় এসে তুমি "খুব দরকারী" বলে আমাকে একটি স্যুটকেস্ রাখতে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি দুই-এক দিনের মধ্যে একটা চাকুরী নিয়ে বোম্বাই চলে যাচ্ছি। কাজেই তোমার সেই স্যুটকেস্ আমি ১নং ক্রৌক্ লেনে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে গেলাম; তুমি সেইখান থেকে নেবার ব্যবস্থা করো। স্যুটকেসের ওপর তোমার নাম লিখিয়ে রেখেছি।

বোম্বাই পৌঁছে তোমাকে চিঠি দেবো; আশা করি তখন তার উত্তর দিতে দেরী করবে না। ইতি—

কলিকাতা, } তোমার
৭।৮।১৯৪৪ } অবিনাশ গুপ্ত।"

চিঠিখানি পড়িয়া তিনি খানিকক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবে বন্ধু অশোকবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "তোমার বাহাদুরী আছে বটে অশোক! আমরা এতকাল

ক্যালকাটা পুলিশে কাজ করেও যার কোন ধারণাই করতে পারিনে, তুমি তা যেন তোমার নখ-দর্পণে এনে ফেলেছ !

তুমি আগেই অনুমান করেছিলে, রতনকে যারা সরিয়েছে, তারা টাকার লোভে সরায় নাই। এমন কোন জিনিষ তারা চায়, যা বইয়ের শেলফে, খাতার ভেতর, বইয়ের ভেতর থাকতে পারে। তোমার এই চিঠিতে শত্রুরা মনে করলে, সেই জিনিষ শুদ্ধ স্যুটকেস্ সে কলকাতায় অবিনাশ গুপ্তর কাছে রেখে এসেছিল, কাজেই তারা খুঁজে পায় নি !

স্যুটকেসের খোঁজে তারা এলো ক্রীক লেনে—আমার বাড়ীতে। সম্পূর্ণ তৈরী থেকেও তুমি কোন বাধা দিলে না, তারা চলে যাবার সময় দু'-একটা ফাঁকা আওয়াজ করে বাধা দেওয়ার একটা ভাণ করলে মাত্র !

চলে তারা গেলো, কিন্তু তোমার গুপ্তচর তাদের অনুসরণ করলে, তুমি শত্রুর আস্তানার একটা ধারণা পেয়ে গেলে। অশোক, আমি যে কি বলে তোমার তারিফ করবো, তা ঠিক্ করতে পারছি না !"

অশোক বসু বলিলেন, "কিন্তু ভাই, বৃথাই তোমার এত প্রশংসা ! আমি পূব দিকে ও পশ্চিম দিকে, দুদিকেই আমার লোক রেখেছিলাম বটে, কিন্তু কাজ হলো কই ?

পশ্চিম দিকে ছিলেন মহিমবাবু নিজে ; কিন্তু তিনি তাদের অনুসরণ করেও শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারলেন না। টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপর থেকে তাঁর গাড়ীর ওপর এমন পাথর-

বৃষ্টি আরম্ভ হলো যে, অতি কষ্টে তিনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন !"

মহিমবাবু বলিলেন, "শুধু পাথর-বৃষ্টিই নয় অশোকবাবু! গাড়ীর সুমুখ দিকে ফুটপাথে বসেছিল এক ভিক্ষুক। সে ব্যাটা তড়াক করে উঠেই পিস্তল হাতে শাসিয়ে বললে, 'গাড়ী ঘোরাও, নয়তো এখনই শেষ করবো।' ব্যাটার দু'হাতে দুটো রিভলভার!

আমার রিভলভার বার করতে যাচ্ছিলাম, ব্যাটা কাছে এসেই বল্লে, 'হাত উঁচু করে বসে থাক্। হাত নামালেই গুলি করবো।' ড্রাইভারকে বললে, 'গাড়ী ঘোরা এক্ষুণি—তা নইলে তোকেও মরতে হবে।'

কাজেই কি আর করি! ফিরে আসতে হলো। লাভের মধ্যে এইটুকুই শুধু জানা গেলো যে, ওদের আস্তানা নিশ্চয়ই টালিগঞ্জের ব্রীজ পেরিয়ে। কিন্তু কোথায় সেই আস্তানা, তার সঠিক ঠিকানা বার করতে পারলাম না!"

হতাশ-কণ্ঠে অশোকবাবু কহিলেন, "তাহলেই দেখ, আগেও যেখানে আমরা ছিলাম, এখনো আমরা সেইখানে—সেই অন্ধকারেই আছি!"

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিল এক উড়ে বেয়ারা। সে সবাইকে লক্ষ্য করিয়া একটা প্রণাম দিল, তারপর কোঁচড় হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিল, "অশোকবাবু কার নাম? তাঁর একখানা চিঠি আছে।"

অশোকবাবু বিস্মিত হইয়া হাত বাড়াইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন :

মান্যবরেষু—

মিঃ বোস! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি, কিন্তু সব কাজেই পিছিয়ে পড়ছেন! আপনি যাদের অনুসন্ধান করছেন, তাদের দেখা পেতে হলে, টালিগঞ্জ-পুল পেরিয়ে মাইল-খানেক গিয়ে, একটা তেরাস্তার মোড় থেকে ডাইনের রাস্তায় চলে যান। মোট কথা, ২৭নং হুসেন খাঁ লেন হচ্ছে সেই ঠিকানা।

কিন্তু সাবধান! সারা পথটাই তারা চোখে-চোখে রাখছে—পুলিশের পোষাকও নিরাপদ নয় আর কিছু না হলেও, সন্দেহ হওয়া মাত্র ওরা পালিয়ে যাবে, তাহলে আর দেখা পাবেন না। সম্ভবতঃ ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীদের সাজে যাওয়া খানিকটা নিরাপদ।

যা করতে হয়, এখনই করা ভালো; নইলে দেরী হয়ে যাবে—পাখী পালাবে। আপনি জয়লাভ করুন, এই আমার কামনা। ইতি,—

হিতৈষী
সাঁওতাল।

রবিবাবু বলিলেন, "কি হে ব্যাপার কি? কে এ সাঁওতাল?"

অশোকবাবু বলিলেন, "আমায় আর জিজ্ঞেস করছ কেন ভাই? এই সাঁওতাল-সম্পর্কে তুমি যতটুকু জান, আমিও ঠিক ততটুকুই জানি। কেবল এইটুকুই বুঝতে পারছি, সে সত্যিই

আমার হিতৈষী। আমার ভুল-ত্রুটী সে দেখিয়ে দিচ্ছে, আর খুব দরকারী খবর সে আমায় অযাচিত ভাবে মাঝে মাঝে জানিয়ে দিচ্ছে।

এর আগে পরীক্ষিতের বিপদের কথা সে আমায় জানিয়ে দিয়েছিল, এখন আবার এমন একটা খবর আমাকে জানিয়ে দিলে, যে খবরের জন্যে আমাদের এত পরিশ্রম ও এত অর্থব্যয়!"

হঠাৎ অশোকবাবুর মনে হইল, উড়ে বেয়ারাটি তখনও তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! বিস্মৃতির ভাব কাটাইয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে, তুই দাঁড়িয়ে কেন? কি চাস?"

সে কহিল, "চিঠিখানা যিনি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, বাবুকে চিঠিখানা দিয়ে দুটো টাকা চেয়ে নিস্।"

অশোকবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, "যা, নিয়ে যা টাকা।"

বেয়ারা চলিয়া গেল। অশোকবাবুও তখনই উঠিয়া রবিবাবুকে কহিলেন, "রবি, তাহলে তোমার পুলিশ-বাহিনী নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়। কিন্তু আগে থানায় চল, সেখানে ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে বেরুতে হবে।

তবে একটা জিনিষ মনে রেখো। ঠিক্ এই সাজে আমাদের যাওয়া চলবে না। একখানি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী চাই। তার মাঝে চারজন থাকবে ষ্ট্রেচার-বেয়ারারের সাজে; একজন থাকবে ডাক্তারের সাজে; একজন থাকবে সাধারণ গেরস্ত-

ভদ্দর-লোকের সাজে। মোট এই ছ'জন থাকবে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে। তা ছাড়া আরো একখানা ট্যাক্সিতে থাকবে পাঁচ-ছ'জন সেপাই; কিন্তু সে ট্যাক্সি পুল পর্য্যন্ত যাবে না, তার আরো অনেক উত্তরে থাকবে। প্রয়োজন হলে আমরা বিগ্‌ল্ বাজিয়ে দেবো, তখন তারা শব্দ লক্ষ্য করে আমাদের সাথে মিশবে। আর দরকার যদি না হয়, তাহলে অ্যাম্বুলেন্স-কার্‌ই যথেষ্ট।

ওঠ রবি, আর দেরী করো না; বেলা এখন দুটো, যেতে যেতে রাত না হয়ে যায়! রাত হলেই অসুবিধা!

উঠুন মহিমবাবু, আপনিও উঠুন।"

দশ মিনিটের মধ্যেই সকলে প্রস্তুত হইয়া একখানি ট্যাক্সিতে চাপিয়া ধর্ম্মতলার থানার দিকে রওনা হইলেন। স্থির হইল, সেখান হইতে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উপযুক্ত পুলিশ-বাহিনীর ব্যবস্থা করা হইবে।

বলা বাহুল্য, অশোকবাবু কলিকাতায় আসিয়াই পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়া, কাজ অনেকটা গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন।

চৌরঙ্গির উপর দিয়া একখানি অ্যাম্বুলেন্স-কার ও তাহার পশ্চাতে একখানি ট্যাক্সি যখন ছুটিয়া চলিল, কলিকাতার বুকে তখন প্রায় সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং গাড়ী ও তাহার আরোহীদিগকে এক রহস্যময় ধূসর যবনিকা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

দশ

—"এখনো বল্ তুই কোথায় রেখেছিস্ ?"

—"ওগো তোমরা মিছামিছি কেন আমার এত মারধোর করছ ? আমি বলেছি তো যে, সে কাগজখানা ছিল আমার ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্সের ভিতর ; কিন্তু সেখানে যখন পাওয়া গেলো না, তখন আমি আর কি বলব ?"

—"বটে ! এখনো চালাকি হচ্ছে ? আচ্ছা বল তো অবিনাশ গুপ্ত তোর কে হন ?"

—"অবিনাশ গুপ্ত ? না, এ নামের কাউকেই আমি চিনি না।"

—"চিনিস্ না, বটে ? আচ্ছা, এই কাগজখানা পড়্ দেখি ! তারপর বল্ এ চিঠি যে লিখেছে সে কে ? আর এই স্যুট্‌কেস্‌ই বা কার ?"

এই বলিয়া লোকটি সেই বন্দী ছেলেটির সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি খবরের কাগজ রাখিল এবং যে অংশে রতনের নামে অবিনাশ গুপ্তের সেই চিঠিখানি ছাপা হইয়াছিল, তাহা আঙুল দিয়া দেখাইল।

ছেলেটি চেয়ারে বসানো অবস্থায় চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সেই অবস্থায়ই সে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাগজের সেই অংশটুকু পড়িয়া ফেলিল।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, তারপর পড়া সম্পূর্ণ হইলে সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল!

লোকটি কহিল, "কিরে ছোঁড়া, এখন তোর কৈফিয়ৎ কি, বল দেখি! কোথায় তোর কাজিরপাড়া, আর কোথায় কল্‌কাতা! মালটা এদিকে চালান দিয়ে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে বেশ কয়েক দিন ঘুরিয়ে নিলি, কেমন?"

বন্দী রতন কহিল, "না, আমি এ চিঠির কিছুই বুঝতে পারছি না! কে এই অবিনাশ গুপ্ত, আমি এ সব কিছুই জানিনে; তোমরা আমায় কল্‌কাতায় এনেছ, এই আমার প্রথম আসা; আমি এর আগে আর কখনো কল্‌কাতায়ই আসিনি!"

—"বটে, এখনো মিথ্যে কথা?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে রতনের নাকে-মুখে বেশ এক ঘা চাবুক আসিয়া পড়িল! "বাপ্‌রে!" বলিয়া রতন চীৎকার করিয়া

—"এখন আর কি হয়েছে! সর্দ্দার আর তাঁর বাঙ্গালী দোস্ত আসুক, তারপর দেখিস্ তোর কি অবস্থা করি! এখন কেবল দু-চার ঘা মুষ্টিযোগ মাত্র তোর দক্ষিণা!—"

—"ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লে রে—"

সরু লিকলিকে একগাছি বেত উপর্য্যুপরি রতনের পিঠে পড়িতেই সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!

ঘরের মধ্যে আরও দু'টি ষণ্ডা লোক রতনের উভয় পাশে

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রতনের আর্তনাদে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল।

লোকটি অবিরত কয়েক ঘা বেত মারিয়া বুঝি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! একটুখানি দম্ লইবার অবকাশে সে কহিল, "একটু অপেক্ষা কর্; সর্দ্দার আর বাঙ্গালী বাবুটি এলেই হয়! তুই ভেবেছিলি, সেই স্যাট্‌কেস্ আর কেউ বার করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের অসাধ্য কিছু আছে? স্যাট্‌কেস্ নিয়ে ওঁরা চলে গেছেন গঙ্গার ওপাড়ে, আমাদের ২নং ক্যাম্পে। সেখানে সেই ছোট্ট গোয়েন্দা—পক্ষী না পরীক্ষা, কি যেন তার নাম—সেই লোকটা আছে তো!

সে হতভাগা প্রথম প্রথম খুব গুণ্ডাগিরি দেখাচ্ছিল! কিন্তু সর্দ্দার রামপিলাই তাকে এখন প্রায় কাদার তাল করে ফেলেছে। একবার যে সর্দ্দারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সে তাকে আর ভুলতে পারেনি। সেই পরীক্ষীর যা অবস্থা হয়েছে, সে তুই নিজের চোখেই দেখতে পাবি। কিন্তু তোর ওপর এখনো তেমন অত্যাচার হচ্ছে না কেন জানিস? তার প্রধান কারণ, তুই একেবারেই ছেলে-মানুষ; আর এখনো তুই সর্দ্দারের হাতে পড়িস্ নাই।

সর্দ্দারকে শুধু তুই চোখেই দেখেছিস্, এখনো তার পরিচয় পাস্ নি। কিন্তু তুই যখন সেই জিনিষটা কল্‌কাতায় চালান করে, নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের এতটা নাজেহাল্ করেছিস্, তখন তোরও আর নিস্তার নেই!

আরে হতভাগা. ভদ্দিনের ছোঁড়া! এত বড সাহস তোর কেমন করে হলো, আমি কেবল সেই কথাই—"

—"ওগো, তোমরা সত্যিই ভুল বুঝেছ! আমি এই অবিনাশ গুপ্ত বা তার লেখা চিঠির বিষয় কিছুই জানিনে! নিশ্চয়ই চিঠিখানি ভূয়ো চিঠি! কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে তোমরা কেমন করে, ভূয়ো চিঠির লেখামত ঠিকানা থেকে আমার নাম-লেখা স্যুট্‌কেস্ উদ্ধার করলে! এ যে একেবারেই অসম্ভব—"

—"হতভাগা পাজি! এখনো চালাকি হচ্ছে?"

সরু লিক্‌লিকে বেতখানা রতনের চোখের সম্মুখে আবার যেন বিজলী খেলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"মা! মাগো!"

সহসা বেগে ঘরে ঢুকিল সর্দ্দার রামপিলাই। সে সরোষে চীৎকার করিয়া কহিল, "দেওকি, শঙ্কু, মুসাফির! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে, আর তারা খুব ভাল ভাবেই লেগেছে। তারা আমাদের ঠকিয়েছে শঙ্কু! আমরা নিশ্চয়ই ওদের ফাঁদে পড়েছি!

স্যুট্‌কেসের ভেতর কি ছিল জানিস্? কতকগুলো বাজে কাগজ—শুধু একখানা সাদা কাগজে লেখা: 'রতন ও পরীক্ষিৎকে আমরা ফেরৎ চাই। আর নিজেরা এসে আত্ম-সমর্পণ করবে, এই হচ্ছে আমাদের হুকুম! অন্যথা করলে তোমাদের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী!'

এত বড় সাহস শয়তানদের যে, সর্দ্দার রামপিলাইকে করে হুকুম! আমি দেখে নেবো কতখানি তাদের ক্ষমতা, আর কতটুকু তাদের বুদ্ধি!

কিন্তু আগে এটাকে নিয়ে চল্,—নিয়ে চল্ আমাদের ২নং ক্যাম্পে। তারপর সেখানে গিয়ে এই ছোঁড়া আর ঐ পরীক্ষিৎ ঘুঘুটাকে জন্মের মত শেষ করে দিয়ে আমরা অন্য কোথাও সরে পড়বো:

ইচ্ছে ছিল, ঐ অশোক বোসটাকেও সাথে নিয়ে যাব; কিন্তু তা আর হলো কই? কে জানে, আমাদের এই আস্তানার খবর ওরা জানে কিনা! ওদের দেওয়া বিজ্ঞাপন পড়ে, ওদের ফাঁদে পা বাড়িয়ে আমরা যখন একটা মিথ্যা স্যুটকেস্ নিয়ে এসে বোকা বনে গেছি, তখন ওরা যে সারা পথ আমাদের পিছু নিয়ে আমাদের ঠিকানা জেনে নেয়নি, তাই বা কে বলতে পারে?—"

—"সত্যিই নিয়েছিল জনাব, কিন্তু আমি একটাকে সাবাড় করে এনেছি!" এই বলিয়া আহত একটি লোককে টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকল মুসাফির!

মুসাফির কখন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। সহসা এমন ভাবে অ্যাম্বুলেন্সের একজন বেয়ারার পোষাকে সজ্জিত একটি লোককে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই সর্দ্দার চমকিয়া উঠিল, "একি, মুসাফির! কি এ? কে এই লোক?"

—"কিছুই জানি না সর্দ্দার! কেবল এইটুকু জানি, নিশ্চয়ই কোন শত্রু—সম্ভবতঃ পুলিশ। এর পকেটে রিভলভার আছে। জানালার এই কোণটায় কান পেতে বাইরে থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের মতো মৃদু আওয়াজ আমার কানে আসে; আমি তখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যাই। তারপর লোকটাকে দেখতে পেয়েই লোহার ডাণ্ডায় ওকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।"

—"বটে, বটে, মুসাফির! তুই আজ যা করেছিস তার উপযুক্ত পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যে তোকে কি বলবো, কি দেবো, তা আমি খুঁজে পাচ্ছি-না! দেখি, দেখি, কে রে তুই শয়তান!"

সর্দ্দার কাছে আসিয়া আহত লোকটির মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর সহসা কহিল, "ওঃ, এ যে আমার চেনা মুখ—আমি একে চিনি! এ হচ্ছে সেই কাজিরপাড়ার দারোগা মহিমবাবু—প্রতাপগড় থেকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হয়ে যিনি রতন আর সেই দীপকের কেস্‌টার ভার নিয়েছেন!"

আনন্দেও ক্রোধে যেন সর্দ্দারের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রশস্ত বুকখানি ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল!

মহিমবাবু অসাড়, অজ্ঞান! তাঁহার মাথার ক্ষতস্থান হইতে তখন প্রবল বেগে রক্ত বাহির হইতেছিল।

সর্দ্দার তাহার মাথায়, পায়ের একটা ঠোকা দিয়া ঘৃণার সহিত কহিল, "কিরে পুলিশের কুত্তা! এখন আর কথা বলিস্ না কেন? তুই কি একদম্ শেষ হয়ে গেলি?"

সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ নীচু হইয়া মহিমবাবুর নাক ও মুখের কাছে নিজের হাতখানি কিছুক্ষণ রাখিল। হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে কহিল, "নারে মুসাফির, এটা মরেনি এখনো! একদম্ মরে গেলে বড় আফ্‌শোষের কথাই হতো! আমি এদের প্রত্যেকটিকে জ্যান্তই চেয়েছিলাম। তা নইলে সর্দ্দার রামপিলাইয়ের কেরামতি এদের দেখাব কেমন করে?

তা বেশ্ হয়েছে! ওরে শঙ্কু, মুসাফির! তোরা এখনই এদের নিয়ে ২নং ক্যাম্পে চলে যাবি, আমি এখানে আগুন লাগিয়ে, এই ক্যাম্প নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে যাব!"

মুসাফির কহিল. "কিন্তু সর্দ্দার, আর বাকিগুলোর যে কোন খোঁজ নেওয়া হলো না?"

—"বাকিগুলো? বাকিগুলো কি রে?"

—"সর্দ্দার! এই শূয়ারের বাচ্চা তো একা এখানে আসেনি! এর সঙ্গে আরো লোক ছিল—তারা সব ভেগেছে।"

—"বটে! তাহলে সে কথা এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন রে গাধা? আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি, তোরা এ দুটোকে এখনই একটা ঝাঁপের ওপর বেঁধে ক্যাল্—কাঁধে করে নিয়ে যাবি!"

সর্দ্দার বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত!

তারপর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে যে ভয়ানক কাণ্ড হইল, তাহা কল্পনা করাও কঠিন !

বিশাল কলাবাগানের মধ্যে অবস্থিত সেই বাড়ীখানি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর কলাবাগানের এখানে-সেখানে লুকানো বোমাগুলি যেন একসঙ্গে বজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া সারা টালিগঞ্জে এক বিভীষিকার সঞ্চার করিল !

জ্বলন্ত বাড়ী-ঘরের আলোয় কলাবাগান ও তাহার চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা দূরে মহিমবাবুর অপর সঙ্গীদের অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল।

—"তবে রে শয়তানের দল !" বলিয়া উৎকট হাসিতে বীভৎস রাক্ষসের ন্যায় দন্তরাজি বিকশিত করিয়া সর্দ্দার রামপিলাই পিস্তল হাতে সেদিকে দৌড়াইয়া গেল ! কিন্তু পরক্ষণেই অশোকবাবুর রিভলভার গজ্জন করিয়া উঠিল—রামপিলাই উরুতে গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পড়িতে পড়িতেও সর্দ্দার তাহার কোমরবন্ধ হইতে এক বাঁশী বাহির করিয়া লইল। নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তীব্র স্বরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে কলাবাগানের অপর এক অংশ হইতে যুদ্ধের দামামা-ধ্বনির ন্যায় আহ্বান-সূচক কাহার বিগ্‌লের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল !

হুইস্‌ল্ ও বিগ্‌লের যুগপৎ শব্দ যেন প্রতিযোগী সিংহ ও ব্যাঘ্রের হিংস্র হুঙ্কারের মত মনে হইল ! ডিটেক্‌টিভ অশোক

বাবু বুঝিলেন, তাঁহারা যত বুদ্ধিমান্ বা যত ধূর্ত্তই হউন না কেন, সর্দ্দার রামপিলাইও তাহাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।

চরম মুহূর্ত্তের জন্য লুকানো বোমা ও আহ্বান-সূচক হুইস্‌ল্, সর্দ্দারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরই পরিচায়ক। এমন লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, বিশেষতঃ মাত্র গুটি-ছয়েক লোক-সম্বল লইয়া তাঁহাদের এখানে উপস্থিতি—আজ যেন অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে হইল!

অশোকবাবু ও রবিবাবুর কানে তখন যেন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিতেছিল! তাঁহারা অস্থির ভাবে এখানে-সেখানে ছুটাছুটি করিয়া আত্মগোপন করিতে সচেষ্ট হইলেন! কিন্তু—তাঁহাদের মনে হইল, সমগ্র কলাবাগান যেন জীবন্ত রাক্ষসের ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে!

সারা কলাবাগানেই তখন চাঞ্চল্য! "মার, মার," করিয়া সকলেই তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! কিন্তু পুলের উত্তরে যে সিপাইদিগকে তাঁহারা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, চরম সঙ্কট-কালে যাহারা ছিল তাঁহাদের একমাত্র আশা-ভরসা,—তাহারা কই?

বিগ্‌লের শব্দ কি তাহারা শুনিতে পায় নাই? না, সে অসম্ভব! তবে?—

অশোকবাবু এবং রবিবাবুও তাঁহাদের অপর সঙ্গীদের ন্যায় নিতান্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। সহসা অ্যাম্বুলেন্স

গাড়ীখানিও দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, তাঁহাদের অসহায় অবস্থাকে শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল।

সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁহারা যেন সর্দ্দারের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের হাসি দেখিতে পাইলেন!

এগারো

—"গোয়েন্দা অশোক বোস্! বল্, এইবার তোর কেমন মনে হচ্ছে?"

এই বলিয়া সর্দ্দার রামপিলাই তাহার প্রকাণ্ড ধারালো ছুরিখানির কিয়দংশ অশোকবাবুর উরুতে ধীরে-ধীরে বসাইয়া দিল এবং ঠিক তেমনই ধীরে-ধীরে, নির্বিকার ভাবে তাহার সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিল। দেখিতে দেখিতে অশোক বাবুর উরুতে প্রায় আধ ইঞ্চি গভীর ও তিন ইঞ্চি লম্বা এক ফাটলের সৃষ্টি হইল। সেই ক্ষত হইতে দর-দর করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল।

সর্দ্দার এক দৃষ্টিতে অশোকবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। অশোকবাবুর যন্ত্রণা ও কাতরতা সে আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিবে, এই তাহার উদ্দেশ্য।

কাঠের একখানি তক্তপোষের সঙ্গে অশোকবাবুকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার হাত-পা বাঁধা,

কিন্তু মুখ খোলা। সম্ভবতঃ যন্ত্রণায় চীৎকার করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল! কিন্তু অপর যে সব বন্দীকে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের মুখেই শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধা। ইহা ছাড়া, তাহাদের প্রত্যেকেরই কোমরে শিকল, পায়ে দড়ি, হাত পিছমোড়া করিয়া পেছন দিকে এক থামের সঙ্গে বাঁধা—এবং সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ চেয়ারে বসাইয়া আঁটিয়া রাখা হইয়াছিল!

সর্দ্দারের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকি ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সে অশোকবাবুকে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিবে, অশোকবাবু অসহ্য যন্ত্রণায় তীব্র আর্ত্তনাদ করিবেন, রবিবাবু ও অন্যান্য বন্দীরা তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া উঠিবে,—আর সর্দ্দার নিজে তাহাদের এ-সব অবস্থা উপভোগ করিতে থাকিবে।

অশোকবাবু যে সর্দ্দারের এই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে। কতকটা সেই কারণে, কতকটা বা অপর বন্দীদের যাহাতে কোন ত্রাসের সঞ্চার না হয় সেই উদ্দেশ্যে, তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাঁহার নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গেলেন! তাঁহার মুখের ভাব সামান্য কিছু বিকৃত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে বিন্দুমাত্র শব্দও বাহির হইল না।

—"বটে! ছোঁড়ার ক্ষমতা আছে বটে!" বিস্মিত সর্দ্দারও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারিল না!

মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সে তাঁহার দিকে

তাকাইয়া রহিল—উৎপীড়নের আবার কোন্ এক নূতন পরিকল্পনা তাহার মাথায় খেলিতে লাগিল! অবশেষে মৃদু আন্দোলনে তাহার মাথাটি ঈষৎ দোলাইয়া, বেশ সুস্থ মস্তিষ্কে, শান্ত ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গীকে কহিল, "শঙ্কু, যা তো, খানিকটা নুন নিয়ে আয় দেখি!"

তারপর তাহার পাশে উপবিষ্ট সহকর্ম্মী বাঙ্গালী বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "কিগো বাঙ্গালী বাবু, বিপুল বাবু! তুমি যে মুষড়ে গেলে দেখছি! তুমি যে কোন কথাই বলছ না! ব্যাপার কি? মায়া ধরে গেল নাকি এই শয়তানটার জন্য?"

শয়তানের সহচর শয়তানই হইয়া থাকে। সর্দ্দার রাম-পিলাইয়ের সহচর বিপুল সেনও তাহার যোগ্য সহকর্ম্মী! সে তাহার বসন্ত-ক্ষত-চিহ্নিত বীভৎস মুখখানিতে এক পৈশাচিক হাসি হাসিয়া কহিল, "না সর্দ্দার, সে ভয় তুমি কোনো দিনই করো না। বাড়ী ছেড়েছি, দেশ ছেড়েছি, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়েছি; তারপর থেকে যে কাজ জীবনের ব্রত বলে বেছে নিয়েছি, যাকে জীবনের সঙ্গী বলে গণ্য করে নিয়েছি, তা আমার অক্ষুণ্ণ থাকবে চিরদিনই। কিন্তু আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি এই ডিটেকটিভটার সহ্য করবার ক্ষমতা দেখে! এমন যন্ত্রণাও লোকে মুখ বুজে সহ্য করতে পারে নাকি?"

—"হ্যাঁ, এইবার দেখবো তোর যথার্থ শক্তি! এইবার দেখবো, সর্দ্দার রামপিলাই তোকে উপযুক্ত ওষুধ দিতে পারে কি না! এই যে নুন এসে গেছে!"

সর্দ্দার শঙ্কুর হাত হইতে নুনের পাত্রটি তুলিয়া লইল ; তারপর বদ্ধ দৃষ্টিতে অশোকবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, খানিকটা নুন সেই ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিল।

কি এক গভীর আর্ত্তনাদ অশোকবাবুর মুখ হইতে প্রায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল ! কিন্তু তিনি তাহা অর্দ্ধপথেই চাপিয়া রাখিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল, চক্ষু-তারকা বিস্ফারিত হইল, তথাপি তিনি তাঁহার ঠোঁট কামড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সেই পৈশাচিক যন্ত্রণাও সহ্য করিয়া রহিলেন !

অপর যে সব বন্দী সেই দৃশ্য উন্মুখ হইয়া দেখিতেছিল, তাহারা কেহই টুঁ শব্দটিও করিতে পারিল না বটে, কিন্তু অশোকবাবুর যন্ত্রণা নিজেদের বুকে অনুভব করিয়া চঞ্চল হইল —শিহরিয়া উঠিল !

—"হ্যাঁ, বাহাদুরী আছে বটে ! আমি তোকে মনে-প্রাণে প্রশংসা করছি অশোক বোস ! এতটা প্রশংসা. এই সর্দ্দার তার জীবনে, আর কখনো কাউকে করেনি ! কিন্তু এইখানেই তোর শেষ নয়, সে কথা তোকে বলে দিচ্ছি।

তুই যদি ভেবে থাকিস যে, সর্দ্দার তোর সহ্য করবার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তোকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে, তাহলে সেটা তোর প্রকাণ্ড ভুল হবে ! সর্দ্দার রামপিলাইয়ের হাত থেকে কেউ কখনো জ্যান্ত ফেরেনি, তুইও ফিরবি না। তোর সেই পরীক্ষিৎ আর রতনকে মারছি তিলে তিলে। এখনই তাদের

মৃত্যু-যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেছে। চাবুক, প্রহার, লাথি, লাঞ্ছনা—এ সব পর্ব্ব তাদের শেষ হয়ে গেছে: এখন সুরু হয়েছে অনাহার। আর এই ভাবেই তাদের শেষ হবে—তারা জীবনে আর কখনো খাবারের স্বাদ ফিরে পাবে না, শেষ মুহূর্ত্তে তাদের জিভটি পর্য্যন্ত কেটে নেওয়া হবে!

আর তোদের ব্যবস্থা? সে এখনো ভালো করে ভেবে উঠতে পারিনি। যাহোক্, দু'-এক দিনের মধ্যেই আমি ঠিক্ করে নেবো।"

কথা বলিতে বলিতে সর্দ্দার যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল! কিন্তু শয়তানের মাথা কখনো নিষ্কর্ম্মা ও অলস হইয়া থাকিতে পারে না। কি এক নূতন আবিষ্কারে, সে সহসা চঞ্চল হইয়া পড়িল! সে তাহার সহকর্ম্মী বিপুল সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, শোনো বিপুল, এই অশোক বোসটার সম্পর্কে আমি একটা কর্ম্ম-পদ্ধতি বার করে ফেলেছি! আমি তোমাকেই তার ভার দিতে চাই।

এই বদমায়েস গোয়েন্দা আমাদের কম হয়রান করে নাই! কম অপদস্থ করে নাই! বুদ্ধিমান্ বলে আমার বড্ড অহঙ্কার ছিল, কিন্তু গোয়েন্দা অশোক বোস আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছে!

পরীক্ষিতের কাছে শুনেছি, এরই পরামর্শে রতনের ঘরের পুলিশ-পাহারা হাল্কা করে রাখা হয়েছিল! আর আমরা তার কিছুই বুঝতে না পেরে, দ্বিতীয়বার চুরির মতলবে সেই ঘরে

প্রবেশ করি ; কিন্তু আমাদের সেই প্রয়োজনীয় কাগজখানার জন্য আমরা যে ভাবে জিনিষপত্র অনুসন্ধান করেছিলাম, তাতে সে স্পষ্ট বুঝে নিলে যে, টাকা-পয়সা আমাদের কাম্য নয় ; আমাদের কাম্য এমন কোন জিনিষ, যা বইয়ের শেল্‌ফে বা বইয়ের ভেতরেও থাকতে পারে।

এর পর করলে সে গাড়ীর খেলা। একটা কাঠের গুঁড়িকে মানুষ সাজিয়ে, সে আমাদের কি ভীষণ ভাবেই না অপদস্থ করলে !

কিন্তু সববশেষে সে যা করেছে, সে হচ্ছে আমাদের চরম অপমান ও চরম লাঞ্ছনা। সম্পূর্ণ এক মিথ্যা গল্প তৈরী করে, মিথ্যা এক চিঠি ছাপিয়ে আমাদের সেইখানে লেলিয়ে নিয়ে গেল ও শেষকালে আমাদের অনুসরণ করে ১নং আস্তানা পর্য্যন্ত এসে গেল !

শোনো বিপুল সেন, তুমি তো আর তখন আমাদের ১নং আড্ডায় ছিলে না, কাজেই ব্যাপারটা তোমার ভাল করে জানা নেই !

এই শয়তান বুদ্ধিটা -বার করেছিল চমৎকার ! টালিগঞ্জ-পুলের কাছে আমার অনেক পাহারা ছিল। হয়তো সে খবর জেনে, আর নয়তো শুধু অনুমান করে, আমার পাহারাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী জোগাড় করে, অ্যাম্বুলেন্সেরই কর্ম্মী ও ডাক্তারের সাজে ১নং ক্যাম্পে উপস্থিত হয়।

হঠাৎ একটাকে ধরে ফেল্লে মুসাফির! তারপর গোটা কলাবাগানটাকে রোশনাই করায়, এরাও ধরা পড়ে গেল; কিন্তু ঐ পুলের ধারে যে কতকগুলো সশস্ত্র পুলিশ এদের সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করছিল, সে আর কে জানতো?

এরা ধরা পড়বার সম্ভাবনা দেখেই বিগল্ বাজিয়ে ঐ সেপাইদের ডেকে পাঠালো; কিন্তু তার পূর্ব্বক্ষণে আমার হুইস্‌ল্ শুনে আমার লোকজনও সেইখান থেকে ছুটে আসছিল! তারা হঠাৎ এতগুলো সেপাইকে দেখে সচকিত হয়ে উঠলো; কিন্তু তাদের ভেতর থেকে একজন সহসা এক বুদ্ধি করে, ওদের গাড়ীর কাছে গিয়ে বললে, 'কর্ত্তারা বড্ড বিপদে পড়েছেন। ডাকাতের দল ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সুদাম ধাড়ার বাঁশবাগানের দিকে! আপনারা এই সোজা যদি ছুটে যান, তাহলেই ডাকাতদের নাগাল পাবেন। তারা তখন মাঝখানে পড়ে আর পালাতে পারবে না। এই রাত-দুপুরে এমন হল্লা শুনে আর খুনোখুনি দেখে আমরা তো বস্তি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। যেতে হলে শীগ্‌গির যান!'

জানো বিপুল, ভজুয়ার এই বুদ্ধিতেই কেবল আমরা নিরাপদে ১নং ক্যাম্প হতে এই ২নং ক্যাম্পে আসতে পেরেছি। ভজুয়া ওদের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, ওরা হয়তো সেই পথে সুদাম ধাড়ার বাঁশবাগান খুঁজে হয়রাণ হচ্ছিল!

ভজুয়ার বুদ্ধি আছে বটে! কেমন বিপুল? হাঃ, হাঃ, হাঃ!"

সর্দ্দারের উচ্চ হাস্যে সমস্ত ঘরখানি যেন কাঁপিয়া উঠিল!

হাসি থামিল ; সর্দ্দার আবার কহিতে লাগিল, "শোনো বিপুল ! তোমাকে যে কথা বলছিলাম।

এই শয়তান গোয়েন্দা আমাদের সবাইকে নিতান্ত কম ভোগায়নি ! কাজেই একে একটা আদর্শ শাস্তি দেবো ঠিক্ করেছি। আর সে ভারটা আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই। শাস্তিটা কি হবে তা শোনো।—

বেশ করে এর হাত-পা বেঁধে নাও। তারপর কোমরে একটা দড়ি বাঁধো। সেই দড়ি ধরে একে নিয়ে যাও গঙ্গার কোন নির্জ্জন অংশে—মাঝখানটায়। তারপর সেই দড়ি ধরে একে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিবে। যখন দেখবে, মরেনি বটে কিন্তু খাবি খাচ্ছে, তখন টেনে তুলবে। এইভাবে ঘণ্টাখানেক চালাও। খুব যখন কাবু হয়ে পড়বে, তখন একে একটা বন্ধ কুঠরীতে রেখে দিবে। সেইখানে এক বিষধর গোখরো সাপ এর পরকালের ব্যবস্থা করে দিবে।

কেমন, পারবে তো বিপুল ? বলো, বেশ করে ভেবে বলো।"

—"হাঁ, পারবো।"

জবাব দিলে বিপুল সেন।

—"বেশ, তুমি তাহলে এখনই এটাকে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণে একটা গোখরো সাপ সংগ্রহ করে ফেল্‌ছি।"

রবিবাবু, মহিমবাবু প্রভৃতি সকলেই লক্ষ্য করিলেন, রক্তাক্ত অশোকবাবুকে যখন বিপুল সেন কয়েকজন অনুচরের

সাহায্যে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়, তখনও তিনি অসম্ভব রকম স্থির ও নির্ব্বিকার!

মনে হইল, সর্দ্দারের উদ্ভাবিত নূতন ধরণের অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি যেন একেবারেই উদাসীন!

সকলেই বিস্ময় বোধ করিলেন। সকলের হৃদয়েই একটা প্রশ্ন জাগিল, অশোকবাবু কি তাহার আসন্ন অত্যাচারের গুরুত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না? তিনি কি প্রকৃতিস্থ, না উন্মাদ?

বারো

অশোকবাবুকে দুই-দুইবার জলে ডুবাইয়া তুলিতে তুলিতে বিপুল সেনও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অশোকবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

কাতর ও ক্লান্ত ভাবে তিনি কহিলেন, "বিপুলবাবু! আমি নিজের জন্য কিছুই ভাবছিনে, দুঃখও করি না; কিন্তু আমার দুঃখু হয় আপনার জন্য!"

—"কেন?"

—"কারণ, আপনি বাঙ্গালী—আমারই দেশের লোক, কিন্তু এই সব বিদেশী ডাকাতদের পদানত চাকর!"

—"আমি যে আপনার দেশের লোক, এ কথা কে বললে?"

অশোকবাবু যেন সত্যই কিসের একটা আভাষ পাইলেন! তিনি কোন যুক্তির সাহায্য লইলেন না—বরং বিপুল সেনকেই পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "কেন, আপনি কি তা অস্বীকার করতে চান বিপুলবাবু?"

বিপুল সেন কহিল, "না, অস্বীকার করবো কেমন করে? কাজিরপাড়ায় আমার ছোট্ট ভাই-বোন, বাপ-মা, সবই যে এখনো রয়েছে! তবে আমি আর নেই—আমি বেরিয়ে এসেছি। আমার সাথে গ্রামের আর কোনো সম্পর্কই নেই।"

অশোকবাবু এবার যথার্থই কিসের সন্ধান পাইলেন! বিপুল সেনের বাড়ী কাজিরপাড়ায়? তবে কে সে? কি এর বাবার নাম?—

তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন না—খুব জানাশোনা লোকের মতই বলিলেন, "বিপুলবাবু! আপনি ভুল করছেন! আপনি ভেবেছেন, গ্রামের সবাই বুঝি আপনার কথা ভুলে গেছে! না, না,—তা অসম্ভব! আপনার সাহস, আপনার কথা—লোকে এখনো ভুলতে পারেনি! আপনার ছোট ভাই তো আপনার কথা বলতে রীতিমত গর্ব্ব বোধ করে!—"

—"বটে! নরেশ তা হলে আমার কথা এখনো মনে করে?"

—"করে বই কি বিপুলবাবু! গ্রামের ছেলেদেরও অনেকেই এখনো আপনাকে শুধু মনেই করে না—আপনার

চেহারাও তাদের মনে আছে—আপনাকে দেখলেই তারা চিনতে পারবে।”

বিপুল সেনের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে ঈষৎ হাসিমুখে কহিল, “হাঁ, সেদিন আমারও তাই মনে হয়েছিল বটে! গ্রামের ছেলে দীপক—কিন্তু আমি যখন গ্রাম থেকে চলে আসি, সে তখন কতটুকু ছেলে! অথচ দশ বছর পরে সেদিন রাতে বোর্ডিংএ জানালার কাছে আমায় দেখতে পেয়েই যেন চিনে ফেললে!

আগে সে নাম বলতে চায়নি বটে, কিন্তু তার বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করায় সে ‘নরেশের দাদা’ প্রায় বলে ফেলেছিল!

কিন্তু মূর্খ হতভাগা! আমি রিভলভারের এক গুলিতেই তার কথা বলবার শক্তি জন্মের মতো বন্ধ করে দিয়েছি!”

অশোকবাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, “বিপুল সেন বলে কি? দীপককে তা হলে নরেন খুন করেনি?

ওঃ! বুঝতে পেরেছি! সে হয়তো বলতে যাচ্ছিল ‘নরেশের দাদা’, কিন্তু ‘নরে’ পর্যান্ত বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর আমরা সেই ‘নরে’ পর্যান্ত উচ্চারণ শুনেই দীপকের হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছি নরেনকে!

কী ভয়ানক! এ দেখছি এক প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে! আচ্ছা, তাহলে গ্রাম থেকে নরেন ছোঁড়াটা পালিয়ে গেল কেন?

দীপকের হত্যাকারী সে নয়; রতনকে সরাবার মূলেও

তার কোন হাত নেই। সে তা হলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ? দীপকের হত্যা আর রতনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সেও গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল কেন ?

সে কি শুধু ভয়ে ? রতনের সঙ্গে তার একটা দারুণ ঝগড়া হয় ; সে তখন রতনকে খুব শাসায়, দীপককেও শাসিয়েছিল। যাদের সে শাসালো, দৈবক্রমে তাদেরই হলো মহা বিপদ। তাই দেখে নরেন হয়তো ভাবলে, এখন গ্রামে থাকলে সমস্ত দোষই তার কাঁধে পড়বে, সে যাবে জেলে বা ফাঁসিতে। কাজেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে !

কেমন ? এই রকম একটা ব্যাপার কি হতে পারে না ? এতে আর অসম্ভব কি আছে ?"

অশোকবাবু চিন্তিত ভাবে মনে মনে ইহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বিপুল সেন কহিল, "কি ভাবছেন অশোকবাবু ?"

অশোকবাবু চট্ করিয়া একটা জবাব ঠিক্ করিয়া লইলেন তিনি কহিলেন, "সে কথা আর না বলাই ভালো। মৃত্যুপথের পথিক আমি ; আমি যদি বলি যে, আপনার ভাই নরেন এখনো একবার আপনাকে দেখবার জন্য পাগল, আপনি তা বিশ্বাস করবেন বিপুলবাবু ?"

—"কেন করবো না ? আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করবো নিশ্চয়ই ; কিন্তু ছেলেবেলা হতেই অসৎ সঙ্গে পা

বাড়িয়ে, আমি বাবার কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছিলাম। বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। কাজেই বাড়ীতে আমার স্থান নেই—তবে নরেশকে আমি একবার দেখা দেবো নিশ্চয়ই।

কিন্তু তাই বলে আপনার বাঁচা হবে না অশোকবাবু! মরতে আপনাকে হবেই। কারণ, আমরা যা চাই, আপনি তাতে বাধা সৃষ্টি করছেন। কাজেই মরতে আপনাকে হবেই। যান, নেমে পড়ুন গঙ্গায়, আর একবার জলের গভীরতা মেপে আসুন।"

বলিয়াই বিপুল সেন হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কায় অশোকবাবুকে জলে ফেলিয়া দিলেন—হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অশোকবাবু সহসা জলে পড়িয়া গেলেন। শুধু কোমরের দড়িটি বিপুল সেন ধরিয়া রহিল।

মিনিটখানেক জলে রাখিয়াই বিপুল পুনরায় তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং একটু বিশ্রাম করিতে না-করিতেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশোকবাবুকে পুনরায় জলে ফেলিয়া দিল।

অশোকবাবু এইবার এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন। বিপুল সেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকিলেও অশোকবাবু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন নাই।

তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তিন-চারিবার জলে ডুবিবার অবকাশে তিনি তাঁহার বাঁধনগুলি ঢিল করিবার প্রয়াস পাইবেন। কাজেও তিনি তাহাই করিতেছিলেন।

অশোকবাবু সন্তরণ-পটু ও ব্যায়াম-বীর। প্রতিবারই জলে

ডুবিয়া থাকিবার সময় তিনি দাঁতের সাহায্যে তাঁহার বাঁধন খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং বাঁধনগুলি অনেকটা শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন! এইবার জলে পড়িতেই তিনি সহসা এমন এক ঝটকা টান মারিলেন যে, বিপুল সেনের হাত হইতে অশোকবাবুর কোমরের দড়ি জলে পড়িয়া গেল—অশোকবাবু একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন!

বিপুল সেন ভাবিয়াছিল, অশোকবাবুকে আর সাপের কামড়ে মরিতে হইল না—সে বেচারা তাহার পূর্ব্বেই গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল! তাই প্রথমে সে কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে আশ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইল!

তবু কিছুক্ষণ সে গঙ্গার জলে যেখানে অশোকবাবু অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

আধ মিনিট যায়, এক মিনিট যায়, আরও কিছুক্ষণ গেল! সহসা এ কি? অনেকটা দূরে অশোকবাবু ভাসিয়া উঠিলেন এবং একবার ভাসিয়াই তীরের দিকে সাঁতরাইতে লাগিলেন।

বিপুল সেন চীৎকার করিয়া তাহার মাঝিকে কহিল, "চালাও, নৌকো ঐদিকে চালাও! লোকটা পালাচ্ছে, ওকে ধরতে হবে।"

মাঝি-মাল্লারা তখনই তীরবেগে সেই দিকে নৌকা চালাইবার উদ্যোগ করিল।

অশোকবাবু বুঝিলেন, কি তাহাদের উদ্দেশ্য! তিনি

হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় অশোক বাবুকে জলে ফেলিয়া দিলেন।

[পৃঃ ৮৯

প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতার কাটিতে লাগিলেন আর চীৎকার করিতে লাগিলেন, "বাঁচাও, বাঁচাও—"

অশোকবাবু জানিতেন, বিপুল সেনের সঙ্গে কোন রিভলভার নাই; কাজেই তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু শুধু তাহাতে আর কি হইবে? নৌকা তখন তাঁহার প্রায় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

তিনি শিহরিয়া উঠিলেন! বুঝি বা রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই! আবার সেই দুরন্ত পিশাচ রামপিলাইয়ের হাতে পড়িতে হইবে?

তিনি এবার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কেবল ডুব-সাঁতারে এখানে-ওখানে দিক্‌-পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি আর রক্ষা হয় না! মাঝিদের এক বৈঠার আঘাত তাঁহার প্রায় মাথার উপর আসিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দিয়া মাথা বাঁচাইলেন।

কিন্তু অশোকবাবু তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—আর তিনি ভাসিয়া থাকিতেই পারেন না। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রমাদ গণিলেন!

মুহূর্ত্তের জন্য আবার একবার তিনি ভাসিয়া উঠিলেন; যতটা পারেন, মাথা উঁচু করিয়া পুঞ্জীভূত শক্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বাঁচাও—বাঁচাও—"

বুকফাটা আর্ত্তনাদের ন্যায় সেই কাতর প্রার্থনা গঙ্গার একূল ওকূল, দু'কূলে প্রতিধ্বনিত হইল!

বিপুল সেন তখন প্রায় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যঙ্গ হাসিতে দন্তপাটি বিকশিত করিয়া সে কহিল, "ওরে দুষমন! আয়, এখনি তোকে বাঁচাই।"

মাঝিদের তীব্র ভৎ‍‍র্সনা করিয়া সে কহিল, "ব্যাটারা দেখছিস্ কি? চালা শীগ্‌গির!"

সহসা সশব্দে কাছেই কোথাও এক ঝলক অগ্নিবৃষ্টি হইল!

ব্যাপার কি, বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই 'গুড়ুম্, গুড়ুম্' করিয়া আবার কোথায় রাইফেল গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সেনের নৌকার একটি গলুই ফুটা হইয়া গেল!

দেখা গেল—ছোট্ট একখানি ষ্টীম-লঞ্চ সদর্পে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে সেই নৌকা লক্ষ্য করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে!

মুহূর্ত্তে বিপুল সেন ও তাহার মাঝি-মাল্লাদের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! নৌকার মুখ ফিরাইয়া তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

—"এইখানটায় সাহেব, ঠিক এইখানটায় সে তলিয়ে গেছে। আমি তাকে তুলে আনবো যেমন করেই হোক্। এই আমার কোমরে দড়ি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, দড়িতে নাড়া পেলে আমায় টেনে তুলবেন।"

এই বলিয়া ছোকরাটি অনুমতির জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তখনই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

তারপর ?—ওঃ! প্রতিটি মুহূর্ত্ত কি সুদীর্ঘ! লঞ্চের সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অধীর আকাঙ্ক্ষায় দড়িটির দিকে তাকাইয়া আছে! সহসা সাহেবের হাতের দড়ি নড়িয়া উঠিল!

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ও সাবধানে সকলে মিলিয়া দড়ি টানিয়া উপরে তুলিতে লাগিল—দড়ি খুবই ভারী মনে হইল!

না জানি কি তাহারা দেখে! এই চিন্তায় আশা ও আশঙ্কায় সকলেরই বুক কাঁপিতে লাগিল।

অবশেষে দড়ির শেষপ্রান্তে উঠিয়া আসিল কোমরে বাঁধা সেই ছোক্‌রা, আর খুব শক্ত করিয়া তাহার বুকে জড়ানো—সংজ্ঞাহীন এক বলিষ্ঠ যুবা—ডিটেক্‌টিভ্‌ অশোক বোস!

ক্ষুদ্র লঞ্চের উপর তুমুল এক আনন্দ-ধ্বনি পড়িয়া গেল!

তেরো

শয়তানের নরক আজ পরিপূর্ণ—মশগুল!

সর্দ্দার রামপিলাই আজ চণ্ড মূর্ত্তিতে নিতান্ত অস্থির ভাবে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ইতস্ততঃ পায়চারী করিতেছিল।

দানবের হুঙ্কারে সে গৃহকোণে রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান বিপুল সেনের দিকে তাকাইয়া কহিল, "বিশ্বাসঘাতক কুকুর! তোকে আমি সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার এই

প্রতিষ্ঠানের প্রধান মন্ত্রীর আসনে আমি তোকেই বসিয়েছিলাম। আমার ছিল শক্তি ও সাহস, আর তোর ছিল মস্তিষ্ক। কাজেই তোকে আমি ভালবাসতাম কত! আর ভালবাসতাম বলেই তোকে আমি সমস্ত দায়িত্বের ভেতর জড়িয়ে নিয়েছিলাম বিপুল সেন!

তা নইলে তুই আমার কে? একটা ঘর-পোড়া বাঙ্গালী—বিদেশী মাত্র! কিন্তু তোকে আমি এতটা বিশ্বাস করেছিলাম যে, শুধু তোরই কথায় আমি এক ভুয়ো লটারী-কোম্পানী খুলে বসি—বাজে ঠিকানা দিয়ে, বাজে নাম দিয়ে। তার লাখ টাকার প্রথম পুরস্কারটা আমি তোরই পরিচিত রতনের নামে তুলে দেই। তুই তখন বলেছিলি, সামান্য কিছু টাকা দিলেই প্রথম পুরস্কারের লাখ টাকা আমাদেরই ঘরে থেকে যাবে; অথচ লোকে জানবে, আমরা লাখ টাকা প্রথম পুরস্কার দিয়েছি। কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের কোম্পানীর লটারীর টিকেট হু-হু করে কেটে যাবে।

কিন্তু তাতে লাভ হলো কতটুকু? লটারীর সেই প্রথম পুরস্কারের টিকেটখানা ফেরৎ- পাওয়া তো দূরের কথা, তার পেছনে যে কত ঝঞ্ঝাট, কত রক্তপাত হলো, তা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়!

শুধু তাইই নয়, এখন নিজেদের জান্ বাঁচানোই কষ্টকর!

ওরে বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী! তোর কি একবার লজ্জাও হলো না যে, এত সব অনর্থের মূল কারণ তুই নিজে? কারণ,

তোরই পরামর্শ মত কাজ করতে গিয়ে আমার আজ এই সর্ব্বনাশ !

তবু আমি তোকে কিছু বলিনি বিপুল সেন ! কারণ, আমি মনে করেছি, ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান দুইই হতে পারে। তোর বুদ্ধিতে চলে, চুরি-ডাকাতিতে এতদিন যে টাকা কামিয়েছিলাম, এখন নয় তারই কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, এই কথাই আমি মনে করেছিলাম। কাজেই এর পরেও আমি তোকে কত বড় দায়িত্বের একটা কাজ দিয়েছিলাম ভাব দেখি !

তোকে বলেছিলাম, ঐ গোয়েন্দা অশোকটাকে জলে চুবিয়ে চুবিয়ে আধমরা করে ফেলবি। তারপর ওটাকে ফেলে দেবো গোখ্‌রো সাপের মুখে !

কিন্তু তুই ওটাকে নিয়ে কি করলি বল্‌ত ? দু'একবার জলে ডুবিয়েই সুরু করলি ওর সাথে ঘর-সংসার কুটুম্বিতার কথা ?—"

বাধা দিয়া বিপুল সেন কহিল, "তুমি ভুল খবর পেয়েছো সর্দ্দার ! আমি তার সঙ্গে কোন ঘর-সংসার—"

—"চুপ্‌ থাক্‌। অনেক বছর তোর কথা শুনেছি ; কিন্তু আর নয়। আমি সব খবরই পেয়েছি, আর সত্যি খবরই পেয়েছি। তবু যদি ধরে নেই যে, তুই কোন কুটুম্বিতার চেষ্টা করিস্‌ নি, তাহলেই বা লাভ কি ? ঐ গোয়েন্দাটাকে তুই পালাবার সুযোগ করে দিলি তো ?"

—"সর্দ্দার ! তুমি একে সুযোগ বল ? দৈবাৎ সে—"

—"আরে উল্লুক! 'দৈবাৎ' কথাটা আমার সামনে তুই উচ্চারণ করতে সাহস পাস? আমার যে 'দেবতা' নেই, 'দৈব' নেই, 'দৈবাৎ' নেই,—একথা কি জানিস্ না তুই?

'দৈবাৎ' মানে কি রে? শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেলি, সে লোক পালিয়ে যায় কেমন করে? পালাবার সুযোগ দিয়েছিস্ তুই!—"

—"আমি?"

—"হাঁ, তুই। বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী, অপর এক বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী দেখেই তোর দরদ উথ্‌লে উঠেছিল! তা নইলে কি ঐ ঘুঘুটা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারে? তা যাক্, ঐ ঘুঘুটা গেছে, তুই আছিস্; তোকেই তার সাজা পেতে হবে।"

বিপুল সেনের কণ্ঠে এবার কাতর অনুনয়ের সুর ফুটিয়া বাহির হইল। সে কহিল, "সর্দ্দার! আমাকে কিছু বলতে—"

—"কিচ্ছু দরকার নেই। দয়ামায়া আমার কাছে বাজে নোংরা জিনিষ। বিদেশী বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করেছিলাম, তার ফল ভোগ আমাকে করতেই হবে। কিন্তু তাই বলে আমি কাউকেই মুক্তি দিয়ে যাব না।

আজ আমি কঠোর, আজ আমি খুবই চটপটে। কাজেই, আজই—এখনই তোদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে, আমি দশ মিনিটের ভেতর এখান থেকে জন্মের মতো সরে পড়বো!"

বিপুল সেন এবার একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল! সে কহিল, "সর্দ্দার! সর্দ্দার! আমি তোমার কাছে—"

—"চুপ থাক্ শয়তান! তোর কোন কথাই শুনতে চাই না।"

এই বলিয়া সর্দ্দার ক্লান্তভাবে একটুখানি যেন অবসর লইয়া আবার কহিল, "ওরে মুশাফির, শঙ্কু, দেওকি! তোরা এখন সব কটাকে এখানে নিয়ে আয়। সেই রতন, ছোট গোয়েন্দা পরীক্ষিৎ, মহিম দারোগা, রবি দারোগা ইত্যাদি যতগুলো আছে,—সবগুলোকে এখানে এনে শেকল দিয়ে সারি সারি বেঁধে ফ্যাল্! গোখ্‌রো সাপটাকেও বাক্সবন্দী করে এদেরই কাছে রেখে দিবি। তারপর—তারপর ঘরের চারদিকে প্রচুর কেরোসিন ঢেলে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবি।

লোহার শেকলে বাঁধা অবস্থায় এরা জ্বলে পুড়ে মরবে। বরাতে থাকে তো, আধপোড়া গোখ্‌রো সাপের কামড়েও দু'-একজন প্রাণ হারাতে পারে!

আমাদের ছিপ্-নৌকো কাছেই তৈরী রাখিস্। এরা যতক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে চেঁচিয়ে গগন ফাটাবে, আমরা ততক্ষণ ছিপ-নৌকোয় গঙ্গা দিয়ে অনেক দূর চলে যাব!

বাংলাদেশের খেলাধূলা আমাদের এই ভাবেই আজ শেষ করবো। যা, মুশাফির, সব বন্দোবস্ত এখনই করে ফ্যাল্—মাত্র দশ মিনিট সময়!"

অনুচরের দল চলিয়া গেল—পীড়নের সমাধিক্ষেত্রে, গৃহকোণে নৃশংস বধ্যভূমিতে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল কেবল দুটি মাত্র লোক—বিপুল সেন ও সর্দ্দার রামপিলাই!

চৌদ্দ

লেলিহান অগ্নিশিখার বুক চিরিয়াও বুঝি আর্ত্তনাদ ফুটিয়া বাহির হয়! সেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ সকলের আগে শুনিল সেই অজ্ঞাত ছোকরা, আর তার পরে শুনিতে পাইলেন সেই অজ্ঞাত ছোকরার অতুলন বিজয়-কীর্ত্তি অশোক বোস!

অশোক বোস তখনও দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল। এতক্ষণে হয়তো গঙ্গার অতল তলে তাঁহার সমাধি হইয়া যাইত! কিন্তু এক অজ্ঞাত ছোকরার কাতর প্রার্থনায়, পোর্ট-পুলিশের এক সাহেব কয়েকজন খালাসীর সাহায্যে, লঞ্চে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া যে ভাবে অশোক বোসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তখনও যেন রূপকথার মতই মনে হইতেছিল!

অশোক বোস সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি অপর বন্দীদের মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন!

বন্দীদের মধ্যে ক্যালকাটা পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর রবি রায়ও ছিলেন। সুতরাং লালবাজারে টেলিফোন করিয়া তখনই একদল সাহায্যকারী পুলিশের ব্যবস্থা হইল। তাহারা অশোক বোসের নির্দ্দেশমত সর্দ্দারের ২নং ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে তখনই রওয়ানা হইল। পথ-প্রদর্শক-স্বরূপ তাহাদের সঙ্গে চলিল সেই অজ্ঞাত-পরিচয় ছোকরা। কারণ, ছোকরা বলিয়াছিল যে, সে ঐ ঠিকানা জানে!

অপর একদল—তাহাদের মধ্যেও লালবাজারের কয়েকজন, পোর্ট-পুলিশের কয়েকজন—অশোকবাবুকে পথ-প্রদর্শক লইয়া জলপথে গঙ্গাবক্ষে ২নং ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হইল।

আগুনের লেলিহান শিখা তখন আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে! বন্দীদের না জানি কি সর্ব্বনাশ হইল, ইহা ভাবিয়া সেই ছোকরা ও অশোকবাবুর বুক কাঁপিয়া উঠিল!

কাছে যাইতেই তাঁহারা শুনিলেন, অগ্নিশিখার আর্ত্তনাদ তখন মানুষের ভাষায় ফুটিয়া, দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে —"বাঁচাও, বাঁচাও, পুড়ে মলাম! জলে মলাম!"

আর্ত্তনাদ, মানুষের আর্ত্তনাদ?—

জ্বলন্ত মানুষের আর্ত্তনাদ যাহারা কখনও শোনে নাই, তাহারা বুঝিবে না সে আর্ত্তনাদে যে কী ভয়ানক বুকফাটা আকর্ষণ! সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করা, মানুষের সাধ্যের অতীত। কাজেই—তখন আর কে সবল, কে দুর্ব্বল, সে প্রশ্ন রহিল না—সে বিচার রহিল না! ছোট-বড় সকলেই, এমন কি সদ্য উদ্ধারপ্রাপ্ত অশোকবাবু পর্য্যন্ত সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন!

কেবল এইটুকুই তাঁহাদের মনে ছিল। তারপর কেমন করিয়া যে সব কয়টি বন্দীর উদ্ধার-সাধন হইল—কে কাহাকে উদ্ধার করিলেন—এসব বিস্তৃত বিবরণ আর কাহারও কিছুই মনে নাই!

উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু তখন সকলেরই অবস্থা প্রায়

ঝলসানো মাছের মত! বিশেষতঃ, রতন ও বিপুল সেনের অবস্থা খুবই সাঙ্ঘাতিক!

কিন্তু সাঙ্ঘাতিক অবস্থার মধ্যেও বিপুল সেনের কণ্ঠ হইতে কেবল এইটুকু কথাই বাহির হইল, "সম্ভব হয় তো সর্দ্দার রামপিলাইকে তার দলবলশুদ্ধ গ্রেপ্তার করুন। সে মাত্র মিনিট-দশেক আগে ছিপ-নৌকোয় গঙ্গার ওপর দিয়ে, সোজা দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে গেছে!"

পোর্ট-পুলিশের লঞ্চ তখনই বায়ুবেগে ছিপ-নৌকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল।

আগুনের উত্তাপে গোখরো সাপটা প্রচণ্ড শব্দে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক সার্জ্জেণ্টের গুলীতে বাক্সবন্দী অবস্থায়ই তাহার পরমায়ু ফুরাইয়া গেল!

তারপর সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত বন্দীদের সকলকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল. সেই অজ্ঞাত-পরিচয় ছোকরাকে সঙ্গে লইয়া অশোকবাবু তাঁহার বন্ধু রবি রায়ের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া অশোকবাবু সেই ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞান হওয়া অবধি আমি তোমায় দেখছি, আর তোমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি। কিন্তু তুমি কিছুই বল্‌ছ না! এর মানে কি, তা জানি না। তুমি কি তোমার পরিচয় আমাদের দেবে না? কি নাম তোমার?"

ঈষৎ হাসিয়া ছোকরা কহিল, "আমার নাম জানতে চান? এখনো তার সময় হয়নি। বন্দীরা আগে সবাই ভালো হয়ে উঠুক্। তারপর বলা যাবে। তবে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমি সাঁওতাল, আপনার হিতৈষী সাঁওতাল!"

—"সাঁওতাল! সেই সাঁওতাল, যে আমাকে দু'-দুবার চিঠি লিখে সাবধান করে দিয়েছিল? কিন্তু এ হলো তোমার ছদ্মনাম, বল তোমার আসল নাম কি?"

মৃদু হাসিয়া ছোকরা কহিল, "সে পরিচয় আমি সকলের সামনেই দিতে চাই মিঃ বোস! সবাই ভাল হয়ে উঠুক, তারপর সে পরিচয় দেবো।"

অশোকবাবু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; বুঝিলেন, এই রহস্যময় ছোকরার নিকট হইতে এখন আর কোন কথা বাহির করা যাইবে না। কে জানে কি তাহার উদ্দেশ্য?"

বিকেল বেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গা পার হইয়া প্রায় সমুদ্রের মোহানায় রামপিলাইয়ের ছিপ-নৌকা পাওয়া গিয়াছে। মাঝি-মাল্লা ও দলপতির অনুচরদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু দলপতি সর্দ্দার রামপিলাই ধরা পড়ে নাই। সে ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিতেই, জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে আর দেখা যায় নাই।

কে জানে, ঐ তাহার আত্মহত্যা, না আত্মগোপন?

চিন্তিত ভাবে সেই ছোকরাটি কহিল, "তা হলে পৃথিবীর একটা বড় আতঙ্ক আজও রয়ে গেল মিঃ বোস!"

অশোকবাবু কহিলেন, "হাঁ, তাই-ই মনে হচ্ছে বটে! সর্দ্দার রামপিলাই যে এত সহজে আত্মহত্যা করবে, তা আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না!"

ছোকরা দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, সে মরেনি—মরতে পারে না। পৃথিবীর যারা আতঙ্ক, তারা যুগে-যুগে এম্‌নি ভাবেই রয়ে যায়—তা নইলে পৃথিবী যে স্বর্গ হয়ে যেতো অশোকবাবু! সবাই তা হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, মহা আনন্দে এখানে বসবাস করতে পারতো! কিন্তু তা আর হচ্ছে কই?"

ছোকরার কথাগুলো অশোকবাবুর বুকেও যেন একটা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিল—তিনি নীরবে কি সব ভাবিতে লাগিলেন!

হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। অশোকবাবু রিসিভার তুলিয়া নিলেন। তিনি শুনিলেন, অপর প্রান্ত হইতে কেহ বলিতেছে, "আমি পুলিশ-হাসপাতাল হতে বলছি, মিঃ অশোক বোসকে চাই।"

—"বলুন, আমারই নাম অশোক বোস।"

—"তা হলে দয়া করে এখনই আসুন; বিপুল সেনের অবস্থা সাঙ্ঘাতিক! কে তাকে এইমাত্র ছোরা মেরে পালিয়েছে!"

—"বটে ! আমি এখনই আসছি।"

অশোকবাবু আর কিছুমাত্র দেরী না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন ; বলা বাহুল্য, সেই ছোকরাও তাঁহার অনুগমন করিল।

পনেরো

রবি রায়ের বাড়ীর সম্মুখে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া থামিয়াছিল। অশোকবাবু, ছোকরাটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলেন। গাড়ী নক্ষত্র-বেগে ছুটিয়া চলিল।

হঠাৎ অশোকবাবুর লক্ষ্য হইল, ড্রাইভারের অপর সঙ্গীটির মাথার পেছন দিকের খানিকটা অংশ যেন অস্বাভাবিক রকমে ফুলিয়া আছে, আর তাহা হইতে তখনও বিন্দু বিন্দু রক্তধারা গড়াইয়া পড়িতেছে !

অশোকবাবু ছোকরাটিকে তাহা দেখাইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "বল ত, কী এ ? নিশ্চয়ই কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে এসেছে !"

কি একটা আশঙ্কায় ছোকরার সমস্ত শরীর সেই মুহূর্ত্তে যেন কাঁপিয়া উঠিল ! সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা ড্রাইভারের সঙ্গীটি বিদ্যুদ্বেগে পেছনে ফিরিয়াই প্রকাণ্ড এক ছোরা হস্তে অশোকবাবুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অতর্কিতে সহসা এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া অশোকবাবু আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না; কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে ছোকরাটির প্রচণ্ড এক পদাঘাতে আততায়ী অনেকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িল—অশোকবাবুর দেহে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু আততায়ীর লক্ষ্যস্থল—অশোকবাবুর বুকে তাহা বিঁধিতে পারিল না, তাঁহার কাঁধে বিঁধিয়া গেল। তারপর কেহ কিছু করিবার পূর্ব্বেই, আততায়ী চক্ষুর পলকে বিড়ালের মত ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে কোথায় মিশিয়া গেল!

তাঁহারা হাসপাতালে পৌঁছিলে, অনেক রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

হাসপাতালের কুলীর বেশেই একটা লোক আসিয়া হঠাৎ বিপুল সেনকে আক্রমণ করে, আর তাহাতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু হাসপাতাল হইতে কেহই অশোক-বাবুকে ফোন করে নাই—সম্ভবতঃ আততায়ী নিজেই তাঁহাকে ফোন করিয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে; ফোন করার পর-মুহূর্ত্তেই সে এক ড্রাইভারের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকিবে বলিয়া একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে—ড্রাইভার তাহা সসঙ্কোচে স্বীকার করিল।

তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আততায়ী তাহার অন্যতম পরম শত্রু অশোকবাবুকেও পৃথিবী

হইতে সরাইবার চেষ্টা করিল। তাহার ফলে অশোকবাবুকেও হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে হইল।

বলা বাহুল্য, এই আততায়ী আর কেহ নহে—সর্দ্দার রামপিলাই। সে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়া, তাহার প্রধান দুইটি শত্রুকে শেষ আঘাত হানিয়া গেল!

অশোকবাবুর সঙ্গে ছোকরাটিকে দেখিয়া, রতন সহসা চীৎকার করিয়া কহিল, "এ কি, নরেন! তুমি এখানে?"

সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল।

মৃদু হাসিয়া নরেন কহিল, "হ্যাঁ ভাই, আমি এখানে। এখন বল দেখি রতন, তোমরা কি আমায় মিথ্যা সন্দেহ কর নাই? মহিমবাবু, আপনি তো দীপকের হত্যাকাণ্ড আর রতনের ব্যাপারেরও তদন্ত করছিলেন! এইবার বলুন, কে আপনাদের আসামী?"

অশোকবাবু তাঁহার আহত অবস্থায়ও বিছানায় বসিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি তা জানি নরেন! বিপুল সেন নিজ মুখে আমার কাছে তা স্বীকার করেছে। দীপককে খুন করেছে বিপুল সেন!

বিপুল সেন সেই ঘরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; কারণ, লটারীর টিকেটের নেশা তখনো তাদের মাথায় মশগুল হয়ে জমে ছিল! এম্‌নি সময় বিপুল সেনকে দীপক দেখে ফেলে। দীপক তাই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল 'নরেশের দাদা', আর সেই মুহূর্ত্তেই সে চিরদিনের জন্য নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়।"

নরেন কহিল, "আপনার কথাটায় সামান্য একটু ভুল থেকে যাচ্ছে স্যার! আমি তা সংশোধনই করে দিচ্ছি। রতনের সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ার পর থেকেই আমি বড্ড অশান্তি বোধ করছিলাম; কারণ, রতন আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমি তাই একটা কিছু আপোষ করবার জন্য বোর্ডিংএর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এম্‌নি সময় আমি দেখতে পাই, এই লোকটা বিপুল সেন, যেন কোন কু মৎলবে ঘরের পেছনে আড়ি পেতে আছে! হাতে ওর পিস্তল।

আমিও তখন একটা ছোরা নিয়ে ওর অনুসরণ করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওকে কোন দুষ্কার্য্য করতে দেবো না, ওকে বাধা দেবো। কিন্তু দীপক হঠাৎ দেখে ফেললে আমাকে!

আমাকে খুনীর বেশে দেখে সে চম্‌কে যায়, সে তার চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজেই পীড়াপীড়ি করায় সে আমার নাম 'নরেন' উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল! কিন্তু 'নরে' পর্য্যন্ত বলতে না বলতেই বিপুল সেন তাকে গুলি করে; কারণ, সে ভেবেছিল, দীপক বুঝি বা 'নরেশের দাদা' এই কথাটি বলে দেয়!

কিন্তু আমি যখন দেখলুম, ঘটনাগুলোর সমস্ত প্রমাণই আমার বিরুদ্ধে—দীপককে শাসিয়েছিলুম, সে খুন হলো; রতনকে শাসিয়েছিলুম, তাকেও আর পাওয়া গেল না,—তখন আমিও শাস্তির ভয়ে গা-ঢাকা দিলুম। কিন্তু এই বিপুল সেনের আশে-পাশে আমি জোঁকের মত লেগে রইলুম।

খবরের কাগজে রতনের নামীয় বিজ্ঞাপন দেখে আমি বুঝে নিয়েছিলাম, এই বিজ্ঞাপনের নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে, আর এবার রঙ্গমঞ্চ হবে ১নং ক্রীক লেন।

আমিও তাই তৎক্ষণাৎ কলকাতায় এসে ঐ বাড়ীটার ওপর লক্ষ্য রাখি। তারপর সর্দ্দার রামপিলাইয়ের দল সেখানে এলে, আমি একটা ভিখারিণী সেজে আগে থেকেই ওদের মোটরের ফুটবোর্ডে চুপ করে বসে রই! আমার উদ্দেশ্য ছিল, কোথায় ওদের আড্ডা, সেটা জানতে হবে।

আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ওরা পরে আমায় দেখতে পেয়ে, আমারই অনুরোধ অনুসারে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যায় বটে, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই, আমি ওদের কথাবার্ত্তায় ওদের ঠিকানাটা জেনে ফেলি; আর চিঠি লিখে, সেই ঠিকানাই আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম অশোকবাবু!"

অশোকবাবু নীরবে মাথা নাড়িলেন।

নরেন বলিতে লাগিল, "সর্দ্দারের আড্ডার পাশে উপস্থিত থেকেও আমি আপনাদের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম। অতি জীর্ণ বেশে মজুর সেজে ছিলাম, কাজেই কেউ আমাকে কোন সন্দেহ করেনি। বিপুল সেন আপনাকে জলে ডুবিয়ে আধমরা করবে, আমি গোপনে এ কথা শুনতে পেয়েই পোর্ট-পুলিশের শরণাপন্ন হই। তারপর আর যা হয়েছে, সে আপনারা সবাই জানেন!"

হাসপাতালের রোগীরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিল। এত বড় একটা আতঙ্কের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ায় সকলেই প্রফুল্ল—সকলেই আনন্দিত।

সকলকেই পাওয়া গেল; কিন্তু পাওয়া গেল না শুধু দুটি লোক। একজন—বিপুল সেন। সর্দ্দারের উৎকট প্রতিহিংসায় তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। আর একজন—সর্দ্দার রামপিলাই, পৃথিবীর এক বীভৎস আতঙ্ক!

ষোলো

নরেনের কথা শুনিয়া রতন চমকিয়া উঠিল। সে কহিল, "বল কি হে নরেন, তুমি এত বড় ধড়ীবাজ?"

হাসিমুখে নরেন কহিল, "ধড়ীবাজ বলছ কেন রতন? তোমার লটারীর টিকেটখানার সুবন্দোবস্ত করে আমি কিছু অন্যায় করেছি?"

—"করেছ বই কি! জানো, ঐ টিকেটখানা দিতে পারিনি বলে আমাকে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে?"

নরেন কহিল, "এখন জানি বটে, কিন্তু আগে জানতাম না। কেউ তোমাকে খুন করেছে বা চুরি করেছে, এইটুকুই শুধু জানতাম! কিন্তু লটারীর টিকেটের জন্য যে এত কারসাজি, তা আমি কেমন করে জানব? তা যদি জানতাম, তাহলে নিশ্চয়ই টিকেটখানা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতাম।

আমারও কি মনে ছিল ছাই? পরীক্ষার হলে তোমার ও আমার ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স যে বদল হয়ে যায়, তা মনে আছে?"

—"হাঁ, এখন মনে হয়েছে। আর সেই জন্যই আমার ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স খুঁজে ডাকাতরা কিছুই ভেতরে পায়নি। আসলে লটারীর টিকেট-শুদ্ধ আমার বাক্স যে তোমার কাছে চলে গেছে, সে তো আমার মনেই ছিল না!"

নরেন কহিল, "হাঁ, আমারও সেই অবস্থা। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে দৈবাৎ তোমার সেই বাক্সের কথা আমার মনে পড়ে। ভাবলুম, যাবার আগে বাক্সটা কাউকে দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে যাব। কিন্তু হঠাৎ খুলে দেখি,—ও বাবা! যে লটারীর টাকার জন্য তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল, তার টিকেটখানাই আমার কাছে!

মনে ভারী আনন্দ হলো! ভাবলাম, দেখা যাক টাকা ডেলিভারী নেবার সময় বাছাধনের কি অবস্থা হয়! কিন্তু টিকেটখানা তো আর আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না। কাজেই লাল একটি বোতলে পূরে, বেশ বন্ধ করে, বোতলটা ঠাকুমাকে দিয়ে বললাম, 'ঠাকুমা, আমি কয়েক দিন আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকবো। তোমাকে এই বোতলটা দিয়ে যাচ্ছি; এর ভেতর একটা লাল দলিল পোরা আছে। দলিলটা যেন কিছুতেই খোয়া না যায়, খুব সাবধানে গোপনে রাখবে।'

আমি জানি, আমার ঠাকুমা এক অদ্ভুত চীজ! যা কিছু তাঁকে দেবে, তিনি অতি যত্নে সব-কিছু রেখে দেন। তাঁর

বাক্সের ভেতর কাগজ ও ন্যাকড়ার অসংখ্য পোঁটলা! সবই তাঁর কাছে খুব জরুরী ও দামী জিনিষ। কাজেই সে জিনিষ—তোমার ঠিকই আছে। দেশে চল, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।"

হতাশ ভাবে রতন কহিল, "আর গেলেই বা কি হবে? "কারণ, লাখ টাকার পুরস্কার যারা দেবে বলে ঘোষণা করেছিল, সেই ভূয়ো কোম্পানীর কর্ত্তারা আজ কোথায়? তাদের কতকগুলো আছে হাজতে, একজন চলে গেছে পরপারে; আর যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট, সেই সর্দ্দারজীও আজ ফেরার। কাজেই টাকা দেবে কে?"

হাসিয়া নরেন কহিল, "টাকা পাও, আর না পাও, তবু তো সারাজীবন মনে থাকবে, ঐ একরত্তি লাল দলিলখানার জন্য পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট হয়ে গেল!"

রতন কহিল, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক্! ঐ লাল দলিলের প্রতিটি লাল অক্ষরের জন্য অজস্র রক্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে!

কতগুলো জীবনই যেতে বসেছিল! আর তুমিও সারা জীবন পৃথিবীতে খুনী হয়েই থাক্‌তে! কেবল তোমার ও মিঃ অশোক বোসের বুদ্ধি ও সাহসেই, আমরা সকলেই আজ রাহুমুক্ত! আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, বন্ধু! মনে প্রাণে

ভাবের উচ্ছ্বাসে রতনের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল

শেষ